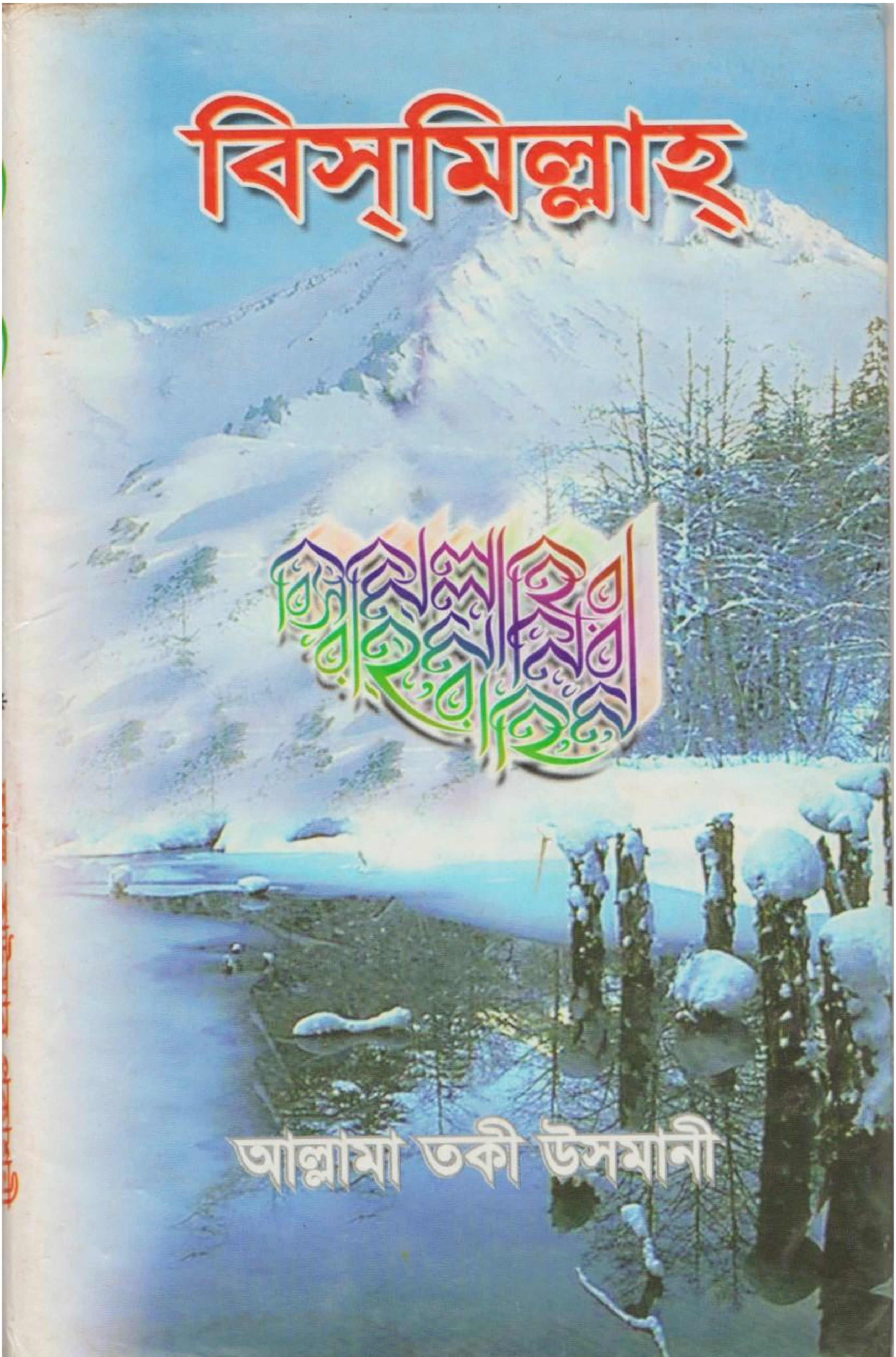
বিস্‌মিল্লাহ্
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লামা তকী উসমানী

আল্লামা তকী উসমানী

বিস্‌মিল্লাহ্‌

ভাষান্তর
হাফেয মাওলানা আইয়ূবুর রহমান

সম্পাদনায়
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস
মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার, (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) ঢাকা

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
২১৭, ব্লক-ত মিরপুর-১২, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৬ ৫ ৪৭৭ মোবাঃ ০১৭১-৩৯১৬৯৭

প্রকাশকাল
রমাযান ১৪২৫ হিজরী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
লালবাগ, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান
চকবাজার, বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/ স্নেহের

....

.... কে

"বিস্‌মিল্লাহ্‌"

নামক বই খানা উপহার দিলাম।

উপহার দাতা

তারিখঃ-

....

ঠিকানা

অবতারণা

আজ সমগ্র বিশ ব্যাপী চলছে কুফর-শিরক, বিদ'আত, বদ্‌দ্বীনী, বে-আমলী ও নাস্তিকতার সয়লাব। পাপ কাজ থেকে বাঁচা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা ও নেক কাজ করা মানুষের কাছে দিন দিন কষ্টকর মনে হচ্ছে। তাই যেন আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শাশ্বত ভবিষ্যদ্বাণী– "এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের পক্ষে গুনাহ্ থেকে বাঁচা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতের তালুতে আগুনের জ্বলন্ত অংগার রাখার মতই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে"–এরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। অসংখ্য মুসলমানের অন্তরে এতটুকু চিন্তাও আসে না যে, আমার কাজটা কি পাপের কাজ না নেক কাজ? হালাল না হারাম? একাজে কি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? আর যারাও বা একটু চিন্তা-ফিকির করে থাকেন তাদের জন্য বিশাল বিস্তৃত এ পৃথিবী বরাবরই সংকোচিত হয়ে আসছে।

হাতে গণা কিছু গুনাহ থেকে কোনও রকমে বাঁচা গেলেও বড় বড় বহু গুনাহ থেকে বাঁচা, নেক কাজ করা, হালার উপার্জন করা ইত্যাদি অনেক মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না। দুঃখ হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেদের উদাসীনতা ও হেঁয়ালির কারণে বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত অনেক মানুষকেই বলতে শোনা যায়, সেকেলে ইসলাম আর শরী'আতের বিধি-নিষেধ এই আধুনিক যুগে মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। অথচ ইসলামী শরী'আতে যে কোনও প্রকার সংকীর্ণতা এবং কাঠিন্যতা নেই তা একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসে বরং সারা পৃথিবীর সকল ধর্মের তুলনায় ইসলামই সবচেয়ে সহজ সরল। সুন্দরতম জীবন যাপনের পরিপূর্ণ নীতিমালা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ইসলামের সুন্দরতম নীতিমালা মেনে চলতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য হঠাৎ করে আমলদার হয়ে যাওয়া খানিকটা কঠিনই বটে।

যেমন প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়াও আজ অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বিস্‌মিল্লাহর গভীর দর্শন ও হাকীকত বুঝি না, এর উপর আমল করে অভ্যস্ত নই। তাই আমাদের এই অবস্থা। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন প্রত্যেকটি কাজ-কর্ম– আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু কর। আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়াই যে কাজ আরম্ভ করা হয় সে কাজ লেজ বিহীন ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বরকত শূন্য হয়ে যায়। মানুষ যদি নিজের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, মহান আল্লাহ তা'আলার অপার মহীমা ও তার অসীম কুদরত সম্পর্কে গবেষণা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ইবদাতের প্রতি তার মন-প্রাণ

আকৃষ্ট হবে। হৃদয় আন্দোলিত হবে –যে একচ্ছত্র মালিক এ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, আমাকে এত এত নেয়ামত ও পুরস্কার দিলেন এবং অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহের বৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত অবগাহন করাচ্ছেন, সেই মহামহীম সত্তারও কি কোনও হক আমার উপর আছে?

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আপন প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের পথে দ্রুত অগ্রসর হও, দৌড়ে যাও। যার সীমানা আকাশ-যমীন সমপরিমাণ আর তা মুত্তাকী বা আল্লাহ ভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান- ১৩৩)

সুতরাং যখনই আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত হবে, আল্লাহর আনুগেত্যের জন্য মন-প্রাণ আন্দোলিত হবে এবং কোনও সাওয়াব ও ভাল কাজ করার সুযোগ এসে যাবে তখন একজন মুমিন বান্দার কর্তব্য হল, অতি দ্রুত ঐ সাওযাব ও ভাল কাজ করে ফেলা। টালবাহানা না করা এবং আগামী দিনের জন্য রেখে না দেওয়া। কিন্তু আজ স্বয়ং হালাল-হারামের ব্যাপারেই নানা জটিলতাসহ বহু বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন ওঠে থাকে। যার সম্পূর্ণটাই আমাদের উদাসীনতা ও খামখেয়ালীর অশুভ পরিণতি। মুসলমানগণ যখনই আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের উপর আন্তরিকভাবেই মনোযোগী হবে, পাবন্দ হবে তখন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদহ্ পালনের সাথে সাথে সুন্নাতে যায়েদাহ্ ও প্রভৃতি নফল আমল করাও অতি সহজ হয়ে যাবে এবং গুনাহ থেকে বাঁচাও তেমন কোনও কঠিন কাজ মনে হবে না। কিন্তু কে বলে আর কে শুনে!

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লামা তাকী উসমানী (দা.মা.) -এর বহুল প্রচারিত গ্রন্থ "ইস্‌লাহী খুতুবাত" থেকে সংগৃহীত ক'টি অংশের সমন্বয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে এ পুস্তিকাটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। আশাকরি পুস্তিকাটি পড়ে পাঠক মহল উপকৃত হবেন। মুনাজাতও করি তাই।

শৈশব থেকেই দু' এক কলম লেখার অভ্যাস থাকলেও অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে এটিই আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা। তাই কাঁচা হাতের অনুবাদে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আপনাদের কারও দৃষ্টিগোচর হলে উদার মনে জানানোর জন্য আন্তরিক আহবান রইল।

বিনয়াবনত

১৫–১০–০৪ ঈ. আইয়ূবুর রহমান

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিস্‌মিল্লাহর দর্শন

প্রত্যেক কাজের শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়া.................................. ১৫
প্রত্যেক কাজের পেছনে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা.............................. ১৬
এক গ্লাস পানি সরবরাহেও আল্লাহ তা'আলার
বিরাট মেহেরবানী কাজ করে.. ১৬
পানীর অপর নাম জীবন.. ১৬
পানি যদি কেবল সমুদ্রে থাকত তবে কি হত?............................ ১৭
পানি মিঠা বানানো এবং সরবরাহ করার মাঝে
আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনা... ১৭
মেঘমালা বিনামূলে পানি সরবরাহের দায়িত্ব
পালন করে... ১৮
পানি সম্পদ মজুদ করা আমাদের
সাধ্যের বাইরে... ১৮
এই বরফ পাহাড় গুলো কোল্ড ষ্টোরেজ....................................... ১৯
সাগর-নদীর মাধ্যমে পানি মজুদ করা.. ১৯
এই পানি আমি পৌছিয়েছি.. ১৯
শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য পানি প্রয়োজন..................... ২০
প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর........................... ২০
প্রত্যেকের শরীরে সক্রিয় মিটার স্থাপিত আছে............................... ২১
দেহাভ্যন্তরে পানি কী কাজ করে?.. ২১
বাদশা হারুন রশীদের এক ঘটনা... ২২
পুরা রাজত্বের মূল্য এক গ্লাস পানি অপেক্ষাও কম.......................... ২২
বিস্‌মিল্লাহ্ -এর মাধ্যমে নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান......................... ২৩
মানুষের কিডনীর মূল্য... ২৪
দেহাভ্যন্তরে আল্লাহ তাআলার কুদরত... ২৪
ভালোবাসা ও ভয় সৃষ্টি হবে.. ২৫
কাফির ও মুসলমানের পানি পানের মাঝে তফাৎ ২৫

কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ কেন?

অযু দ্বারা বাতেনী নূরও পয়দা করাও উদ্দেশ্য.......................... ২৭
অযুর নিয়্যাত করবে.. ২৮
অযুর পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়বে.. ২৮
'বিস্‌মিল্লাহ্' বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ
নূর হাসিলের মাধ্যম.. ২৮
গুনাহ বিদূরীত হওয়ার কারণও অযু....................................... ২৯
কেবল সগীরা গুনাহই মাফ হয়... ২৯
বিস্‌মিল্লাহ্ -এর উপকারিতা.. ৩০
বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার মাঝে কি হেকমত?....................................... ৩১
ঐ প্রাণী হালাল নয়.. ৩১
যবাহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার নিগুঢ় তথ্য.......................... ৩২
কেন তোমরা প্রাণীদের মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দাও?......................... ৩২
এ প্রাণী তোমাদের জন্য সৃষ্ট.. ৩৩
বিস্‌মিল্লাহ্ -এর স্বীকারোক্তি.. ৩৩
বিস্‌মিল্লাহ্ -এর আরও এক দর্শন... ৩৪
জীবনও নাও,সাওয়াবও পাও ৩৪
এক মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি.. ৩৫
বিস্‌মিল্লাহ্ -এর দ্বারা দুটি তথ্য প্রকৃতির
স্বীকারোক্তি.. ৩৬

ভাল কাজে দেরী করতে নাই

ভাল কাজে তড়িগড়ি করা... ৩৯
নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা.. ৪০
শয়তানী প্ররোচনা ৪১
প্রিয়জীবন থেকে কল্যাণ লুফে নাও ৪১
নেক কাজের স্পৃহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে
আগত এক মেহমান ৪১
সময়-সুযোগের অপেক্ষায় থেকো না.. ৪২
কাজের উপযুক্ত সময় ৪২

নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা মন্দ নয় ৪২
দুনিয়াবী আসবাবপত্রে প্রতিযোগিতা করা
জায়েয নয় ৪৩
তাবুক যুদ্ধে হযরত উমর ফারূক (রাযি.) ও
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর প্রতিযোগিতা ৪৪
এক বেনযীর দৃষ্টান্ত ৪৫
প্রাণ সঞ্জীবনী অমর্ত্য সুধা ৪৬
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক
কেমন প্রশান্তি লাভ করেছেন!.. ৪৬
অন্যথায় কখনও আত্মতৃপ্তি পাবে না... ৪৭
অর্থ-কড়ির বিনিময়ে শান্তি কেনা যায় না..................................... ৪৭
সেই অর্থ সম্পদ কোন কাজের! ৪৮
টাকা-পয়সায় সব কিছু কেনা যায় না ৪৯
শান্তির পথ.. ৪৯
কঠিন পরিক্ষা সন্নিকটেই ৫০
"এখনও তো যুবক" –এক প্রবঞ্চনা ৫২
নফ্‌সকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ উদ্ধার করো.................................. ৫২
হঠাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের বার্তা এলে! ৫৩
প্রকৃতই যে জান্নাত চায়.. ৫৪
আযানের ধ্বনী শুনে নবীজীর অবস্থা ৫৫
উত্তম সদকা ৫৫
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে অসিয়্যত কার্যকর হবে ৫৬
আয়ের এক তৃতীয়াংশ সদকার জন্য
পৃথক করে রাখ ৫৬
আল্লাহ তা'আলার কাছে সংখ্যার হিসেব হয় না ৫৭
আমার আব্বাজানের নিয়ম ৫৭
প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত সদকা করবে ৫৮
কিসের প্রতিক্ষায় আছ? ৫৮
কী, দৈন্যতার প্রতিক্ষায় রয়েছে? ৫৯

কী, ধনাঢ্যতার অপেক্ষায় আছ? ৫৯
কী,রুগ্নতার অপেক্ষা করছ? ৬০
কী, বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ? ৬০
কী, মৃত্যুর অপেক্ষায় আছ?........................ ৬১
মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাত ৬২
কী, দাজ্জালের অপেক্ষা করছ? ৬৩
কী, কিয়ামতের অপেক্ষা করছ? ৬৪

হালাল উপার্জন ছাড়বে না

জীবিকার কারণ " মিন জানিবিল্লাহ" ৬৭
জীবিকা নির্বাহের খোদায়ী ব্যবস্থা........................ ৬৮
জীবিকা বন্টনের বিস্ময়কর ঘটনা ৬৯
রাতে ঘুমানো আর দিনে কাজ করা
সহজাত স্বভাব ৭০
রিযিকের দ্বারা বন্ধ করো না........................ ৭১
এটা আল্লাহ তা'আলার দান........................ ৭১
সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে........................ ৭২
হযরত উসমান গণী (রাযি.) কেন খিলাফত ছাড়েন নি........................ ৭২
জনসেবার পদ আল্লাহ দান........................ ৭৩
হযরত আইয়ূব (আ.) এর ঘটনা........................ ৭৪
ঈদ-সালামী বেশি চাওয়ার ঘটনা........................ ৭৫
সার কথা........................ ৭৬

সমাপ্ত

বিস্‌মিল্লাহর দর্শন

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد- فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم كل امر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع

প্রিয় পাঠক!

হাদীস শরীফে রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে শুরু করা হয়নি তা লেজ কাটা বা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রত্যেক কাজের শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়াঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" এমন এক কালিমা যা প্রত্যেক কাজের শুরুতে পড়ার জন্য আমাদেরকে নিদের্শ দেওয়া হয়েছে। সকালে বিছানা থেকে উঠার সময়, গোসল খানায় যাওয়ার সময়, গোসল খানা থেকে বের হওয়ার সময়, খানা খাওয়ার পূর্বে, পানি পান করার পূর্বে, বাজারে যাওয়ার সময়, মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে, মসজিদে থেকে বের হওয়ার সময়, কাপড় পরিধান করার সময়, যানবাহনে আরোহন করার সময়, গাড়ী চালানোর সময়, যানবাহন থেকে নামার সময়, ঘরে প্রবেশ করার সময় তথা সব সময় প্রত্যেক কাজের শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পড়া চাই।

প্রত্যেক কাজের পেছনে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা

পেছনে আমি বলেছি, প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে আমরা যা পড়ছি বা যা পড়ার জন্য আমাদেরকে তাগিদ করা হচ্ছে তা কোন যাদুমন্ত্র নয় বরং এর পেছনে রয়েছে এক মহা দর্শন এবং এর মাধ্যমে এক মহান বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। তা হল, জীবনে যে কাজই মানুষ করে থাকে তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাওফীক ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, যে কাজ আমি করছি তা আমার প্রচেষ্টা ও শ্রমেরই ফল তথাপি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখার যাবে, সে কাজের পেছনে নিজের প্রচেষ্টা ও শ্রমের দখল রয়েছে সামান্য মাত্র। মূলতঃ এর পেছনে মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিরাট ব্যবস্থাপনা অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এক গ্লাস পানি সরবরাহেও আল্লাহ তা'আলার বিরাট মেহেরবানী কাজ করে

উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ করুন, পানি পান করার পূর্বে "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" পড়ার যে নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তা একেবারেই মামুলী ব্যপার নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, পানি পান করা নিতান্তই সাধারণ একটি কাজ মাত্র। কেননা ঘরে পানি সরবরাহ করার জন্য আমরা পাইপ লাইন নিয়ে রেখেছি। পাশাপাশি পানি ঠান্ডা করার জন্য কুলার ও ফ্রীজ রয়েছে। সুতরাং ফ্রীজ থেকে ঠান্ডা পানি বের করলাম এবং পান করে নিলাম। এখন বাহ্যতঃ দেখছি যে, এই ঠান্ডা পানি পাওয়ার পেছনে আমাদের প্রচেষ্টা, শ্রম এবং পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকেরই এ খেয়াল হয়ে থাকে যে, এক গ্লাস ঠান্ডা পানি যা আমরা মুহূর্তেই পান করে ফেলি, এ পানি আমাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছানোর পেছনে আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত কিভাবে কাজ করছে?

পানীর অপর নাম জীবন

লক্ষ্যনীয় যে, পানি এমন এক জিনিস যার উপর প্রতিটি জীবনের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

অতএব পানি কেবল মানব জাতির জন্যই নয় বরং প্রত্যেক প্রাণীরই সৃষ্টির প্রকৃত উৎস এবং গোটা প্রাণীজগতের জীবনের অস্তিত্বও এ পানির ওপরই। এ কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা নিখিল সৃষ্টিজগতের মাঝে পানি এত পর্যাপ্ত পরিমাণ সৃষ্টি করেছেন যে, যদি গোটা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থলভাগ হয়ে থাকে তবে দুই তৃতীয়াংশই সাগর-নদী রূপে পানি। এ সাগর নদীতেও অসংখ্য সৃষ্টিজীব বসবাস করে। যারা প্রত্যেহ জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যু বরণও করে। সাগর-নদীর এ পানি যদি মিষ্টি হত তবে তা দূষিত ও দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত। এজন্য আল্লাহ তা'আলার গভীর প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্ম দর্শন এ পানিকে স্রোতধর, লবনাক্ত এবং তিক্ত বানিয়ে রেখেছে। যেন এ লবনাক্ত অংশ ঐ পানিকে দূষিত ও দূর্গন্ধযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

পানি যদি কেবল সমুদ্র থাকত তবে কি হত?

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা যদি বলে দিতেন, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্ররূপে পানি সৃষ্টি করে রেখেছি এবং তা নষ্ট ও দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তাতে লবনাক্ততাও সৃষ্টি করে রেখেছি। এখন তোমাদের কাজ হল, তোমাদের কারও যদি পানি প্রয়োজন পড়ে তবে সমুদ্রে গিয়ে পাত্র ভরে পানি নিয়ে এসো। অতঃপর তা মিষ্ট করে পান কর এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার কর। এ-ও অসম্ভব ছিল না। সত্যি যদি সমুদ্র থেকে পানি এনে নিজের প্রয়োজন মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হত, তবে কি কোনও মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল? ধরে নাও, কেউ সমুদ্র থেকে পানি নিয়েও আসল তথাপি সমুদ্রের ঐ লবনাক্ত পানি মিষ্টি পানিতে রূপান্তর করা কিরূপে সম্ভব ছিল?

পানি মিঠা বানানো এবং সরবরাহ করার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনা

সৌদি আরবে সমুদ্রের পানি মিষ্টি করার লক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বৃহৎ এক পরিকল্পনা বাস্তবায় করা হয়। জাগায় জাগায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়ে, এ কাজে বিরাট বড় অংকের বাজেট ব্যয় হয়েছে। অতএব পানি ব্যবহারের সময় খুব সতকর্তা অলম্বন করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রের লোনা পানি মিষ্টি করার জন্য সকলের দৃষ্টির অন্তরালে এ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন যে, সমুদ্র থেকে চুপচাপ মেঘমালা উঠিয়ে নেন আর মেঘমালার মাঝে এমন সক্রিয় প্লান সৃষ্টি করে রেখেছেন, যাতে সমুদ্রের ঐ খারযুক্ত লোনাপানি মেঘমালার আকৃতিতে উপরে উঠে

যায়। তখন তার তিক্ততা বিদূরীত হয়ে দূষণমুক্ত ও মিঠা হয়ে যায়। তাছাড়া যেসব লোক সমুদ্র থেকে সহস্র মাইল দূরে বসবাস করে এবং যাদের পক্ষে সমুদ্র থেকে পানি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। সে সব লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মেঘমালারূপে বিনামূলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মেঘমালা বিনামূলে পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে

কিছু দিন পূর্বে আমি নরওয়ে গিয়ে ছিলাম। সেখানকার লোকেরা বললেন– যেহেতু এখানকার পানি স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও উপকারী মনে করা হয় এ জন্য অনেক রাষ্ট্রে এই পানি রপ্তানি হয়। অতএব কারণেঁ বিশাল বিশাল ক্যান্টিনে ভরে জাহাজ মারফত এই পানি অন্যান্য রাষ্ট্রে পৌছে দেওয়া হয়। ফলে এক লিটার পানি বাবদ এক ডলার খরচ হয়। যা আমাদের হিসাবে ৬২ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির জন্য চাই সে মুসলমান হোক কিংবা কাফির হোক শর্তহীনভাবে মেঘমালরূপে বিনামূলে স্বয়ংক্রিয়া কার্যনির্বাহীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই মেঘমালা সমুদ্র থেকে ওঠে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে চলে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, গোটা পৃথিবীর কোন ভূ-খন্ড এ সার্ভিসের আওতামুক্ত থাকে না। মেঘমালা আসে, গর্জন করে, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে এবং চলে যায়।

পানি সম্পদ মজুদ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে

আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মেঘমালারূপে আমাদের ঘর পর্যন্ত পানি পৌছে দিয়ে যদি বলতেন– আমি তোমাদের ঘর পর্যন্ত পানি পৌছে দিলাম, এখন তোমরা পূর্ণ বছরের জন্য পানি স্টক বা মজুদ করে রাখ; হাউস ও টাঙ্কি বানিয়ে তাতে এ পানি সংরক্ষণ কর। তাহলে বর্ষার মৌসুমে পূর্ণ বছরের পানি মজুদ করে নেওয়া মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ছিল? পূর্ণ বছর চলাব জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি মজুদ করার মত এমন কোনও কোল্ড স্টৌরিজ ব্যবস্থা কি মানুষের কাছে রয়েছে ? অতঃপর যেখান থেকে পানি নিয়ে বছর ভরে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করবে? আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন, এ দুর্বল ও হীনবল মানুষের পক্ষে এ কাজও সম্ভব নয়। কারণেই তিনি ইরশাদ করেন– এই বৃষ্টির পানি তোমরা যতটুকু পরিমাণ মজুদ করতে পার এবং ব্যবহার করতে পার করে নাও। বাকী বছরের জন্য পানি মজুদ রাখার দায়িত্বভাব স্বয়ং আমিই নিচ্ছি।

এই বরফ পাহাড়গুলো কোল্ড স্টোরেজ

অতএব কারণে এ মেঘ-বৃষ্টি পাহাড়ের উপরেও বর্ষণ করলেন এবং ঐ পাহাড়সমূর্কে এ পানি সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরিজ বানিয়ে দিলেন। জমা রাখলেন বরফ আকারে এবং এত উচুঁতে সংরক্ষণ করলেন, যেখানে পানি দূষণকারী কোনও জীবাণুও পৌছুতে সক্ষম হয় না। সাথে সাথে তাপমাত্রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখলেন যে,পানি বিগলিতও হতে পারে না। এসব উঁচু পাহাড়গুলো এক দিকে মানুষকে নয়নাভিরাম দৃশ্যপট উপহার দেয়, অপর দিকে মানুষের গোটা জীবনের জন্য পানি সম্পদ সংরক্ষণ করে।

সাগর-নদীর মাধ্যমে পানি মজুদ করা

মানুষকে যদি বলা হত, আমি তোমাদের জন্য পাহাড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সম্পদ মজুদ করে রেখেছি। এখন যাব যা প্রয়োজন পড়ে সে ওখান থেকে গিয়ে নিয়ে এসো। তাহলে ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ গলিয়ে পানি আনা এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা কি কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল? না, এটাও মানুষের ক্ষমতাধীন ছিল না। কারণেই আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঐ বরফের উপর উত্তাপ ছাড়াও, কিরণ বিচ্ছুরিত কর এবং ঐ রবফ বিগলিত কর। অতঃপর সাগর-নদী ও খাল-বিল আকারে পানিপথও আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করে দিলেন। তাই ঐ বরফ গলে ঝরণা হয়ে পাহাড়ের নিচে ঝরে পড়ে এবং প্রবাহমান সাগর-নদী রূপে সারা দুনিয়ায় সরবরাহ হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা যমীনের পরতে পরতে পানি স্তর এমনভাবে রেখে দিয়েছেন, যেভাবে পাইপ লাইন বিছানো হয়ে থাকে। এখন তোমরা দুনিয়ার যে ভূ-খন্ডে ইচ্ছে মাটি খনন কর এবং পানি বের করে নাও।

এই পানি আমি পৌছিয়েছি

যে পানি আল্লাহ তা'আলা সমুদ্র থেকে উঠিয়ে পাহাড়ে বর্ষণ করলেন, অতঃপর পাহাড় থেকে প্রবাহিত করে যমীনের এক একটি কোষে পৌছে দিলেন, সে পানি খানিকটা পরিশ্রম করে নিজ ঘরে নিয়ে আস। ব্যাস, মানুষের কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই। অতএব যে পানি তোমরা গলধঃকরণ করছ, যদি এতটুকুও চিন্তা কর তবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই সামান্য পানির পেছনে নিখিল বিশ্বের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়েছে। তারপর এ পানি তোমাদের মুখ পর্যন্ত পৌছেছে। তোমাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত এ পানি পৌছানোর পিছনে তোমাদের বাহুবলের কারিশমা নয় বরং এটা আল্লাহ

তা'আলার সৃষ্টিগত নেযাম ও কুদরতের উত্তম ব্যবস্থাপনা। যার কারণে মানব জাতি এবং সমগ্র প্রাণী জগত এ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং "পানি পান করার সময় আল্লাহর নাম নাও এবং "বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পড়"–এ নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে মানব জাতিকে ঐ সুক্ষ্ম বাস্তবতার দিকেই দৃষ্টি আর্ষকণ করা হচ্ছে।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য পানি প্রয়োজন

অতঃপর আমরা গ্লাসে পানি নিলাম এবং তা কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে নামিয়ে নিলাম। কিন্তু এ পানি কোথায় যাচ্ছে ? শরীরের কোন অংশে কি উপকার করবে? পানি পানের পরবর্তি এ সব অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কারও জানা নেই। অসহায় এ মানুষের সে সম্পর্কে কোনও ধারণা-জ্ঞান নেই। সে তো কেবল এতটুকু জানে যে, আমার পিপাসা লেগেছিল, অতঃপর পানি পান করে নিয়েছি। তাতে আমার পিপাসা মিটে গেছে। কিন্তু কেন তার পিপাসা লেগেছিল? পিপাসা লাগার পর যখন সে পানি পান করল তখন ঐ পানির শেষফল কি দাঁড়াবে? এ সবের কোনটাই এই অবোধ মানুষের জানা নেই। আরে ভাই! শুধুমাত্র মুখ ও কণ্ঠনালীরই পানি প্রয়োজন পড়েছে বলে তোমাদের পিপাসা লাগেনি বরং তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পানি প্রয়োজন ছিল। আর সে কারণেই তোমাদের পিপাসা লেগেছিল। শরীরে যদি পানি না থাকে তাহলে মানুষের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যাবে। দেখা যায়, কারও সামান্য ডায়রিয়া হলে পরে শরীরে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়, পানি কমে যায়। তখন দুর্বলতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে চলা-ফেরাই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

সুতরাং একদিকে তো মানুষের শরীরিক সুস্থতার জন্য প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই পানির প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য মানুষের পিপাসা লাগে এবং সে পানি পান করে। অপর দিকে এ প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য যে, ঐ পানি শরীরিক চাহিদা অপেক্ষা বেশি না হয়ে যায়। কেননা যদি প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি শরীরে জমে যায় তবে শরীর ফুলে যায়। আর যদি এই পানি শরীরের এমন কোন স্থানে জমে যায়, যেখানে জমে যাওয়া উচিৎ নয় তাহলে এর ফলে বহু রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঐ পানি যদি ফুসফুসে জমে যায় তবে মানুষ টিবি রোগে আক্রান্ত হয়। আবার যদি সে

পানি পিসলিতে জমে তবে এজমা রোগ হয়ে যায়। অতএব কারণে কারও শরীরে যদি প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি জমে যায় তবে তা সে মানুষের জন্য আশঙ্কাজনক। আর যদি পানি স্বল্পতা বা পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা-ও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। কেননা মানব দেহের মধ্যে বিশেষ এক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পানি থাকা বাঞ্চনীয়।

প্রত্যেকের শরীরে সক্রিয় মিটার স্থাপিত আছে

পানির নির্দিষ্ট পরিমাণ কতটুকু? যে মানুষ গন্ডমূর্খ, এক অক্ষরও লিখতে-পড়তে পারে না। শরীরে কতটুকু পরিমাণ পানি থাকা চাই আর কতটুকু না থাকা চাই –সে কিভাবে উপলব্দি করবে? এজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের দেহাভ্যন্তরে একটি স্বয়ংক্রিয় মিটার স্থাপন করে দিয়েছেন। মানবদেহে যখন পানির অভাব হয়, ঐ মিটারে ধরা পড়ে আর তখনই মানুষের পিপাসা লেগে যায়। কণ্ঠনালীর অধিক শুষ্কতা পিপাসা লাগার মূল কারণ নয় বরং এ পিপাসা লাগার কারণ হল, তোমাদের দেহাভ্যন্তরে পানি প্রয়োজন। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের এ অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পিপাসা সৃষ্টি করে দিলেন। অতএব কারণে যে শিশু কিছুই জানে না সে-ও নিশ্চয় এটা জানে-বুঝে যে, আমার পিপাসা লেগছে, তা নিবারণ করতে হবে।

দেহাভ্যন্তরে পানি কী কাজ করে?

এ পানি দেহাভ্যন্তরে পৌছার পর শারীরিক পাইপ লাইন তথা শিরা-উপশিরার মাধ্যমে ঐ সকল স্থানে পৌছুতে থাকে যেখানে যেখানে পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতঃপর প্রয়োজনের তুলনায় যতটুকু পানি বেশি হয়ে যায় তা শরীর পরিচ্ছন করার পর প্রস্রাব হয়ে মূত্রনালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেন ঐ নোংরা ও দূষিত পানি দেহাভ্যন্তরে থেকে জীবাণু সুষ্টি না করে।

আমরা সকলেই মুহূর্তের মধ্যে পানি পান করে নেই কিন্তু কখনও চিন্তা করি না যে, এ পানি কোত্থেকে এসেছে? কিভাবে আমাদের মুখ পর্যন্ত পৌছেছে? কিংবা দেহাভ্যন্তরে যাওয়ার পর এ পানির শেষফল কি দঁড়াতে পারে? আর কোন্ সে মহান সত্ত্বা এই পানির তদারকি করছেন? অতএব কারণে "বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" কালিমাটা বস্তুতঃ এ সকল গভীর দর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

হারুন রশীদের এক ঘটনা

বাদশা হারূন রশীদ একবার নিজস্ব রাজসভায় বসেছিলেন। পান করার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলে। পাশেই ছিলেন আল্লাহ প্রেমে আত্মভোলা কিসিমের এক লোক, ধ্যানমগ্ন হযরত বাহ্‌লূল (রহ.)। বাদশা হারূন রশীদ যখন পানি পান আরম্ভ করবেন তখন হযরত বাহ্‌লূল (রহ.) বাদশা হারূন রশীদকে লক্ষ্য করে বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন! এক মিনিটের জন্য একটু থামুন! বাদশা থেমে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– কি ব্যাপার? জবাবে তিনি বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আর তা হল, এখন তো আপনার ভারী তৃষ্ণা পেয়েছে, পানি ভর্তি গ্লাসও হাতে আছে। এ পানি পানের আগে অনুগ্রহ করে একটি কথা বলুন! যদি আপনি মরুপ্রান্তরে কিংবা গহীন অরণ্যে থাকেন আর এমনই তৃষ্ণা পায় এবং সেখানে কোথাও পানি না পাওয়া যায় আর পিপাসা ক্রমেই কঠিন হতে থাকে তাহলে আপনি এক গ্লাস পানি পাওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবেন?

হারুন রশীদ জবাব দিলেন– প্রচন্ড তৃষ্ণার সময় যদি পানি না পাওয়া যায় তখন যেহেতু পানি শূন্যতায় মৃত্যু প্রায় অবধারিত। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে সবই ব্যয় করব। অন্তত যেন জীবন বেঁচে যায়। এ কথা শুনে বাহ্‌লূল (রহ) বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন! এখন আপনি "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পড়ে পানি পান করে নিতে পারেন।

পুরা রাজত্বের মূল্য এক গ্লাস পানি অপেক্ষাও কম

বাদশা হারূন রশীদ যখন পানি পান করে নিলেন তখন সাধক বাহলূল (রহ) বললেন– আমীরুল মুমিনীন! আমি আরও একটি প্রশ্ন রাখতে চাই! বাদশা জানতে চাইলেন, কি সে প্রশ্ন? সাধক বাহলূল (রহ:) বললেন– আপনি এই মাত্র যে পানি পান করলেন, তা যদি আপনার দেহাভ্যন্তরে থেকে যায়, বের না হয় এবং প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। মূত্রথলি প্রস্রাব ভর্তি থাকে, বের করার কোনও পথ না হয় তবে তা বের করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন। হারুন রশীদ জবাব দিলেন– যদি প্রস্রাব না হয়, বন্ধ হয়ে যায় এবং মূত্রথলি প্রস্রাব ভর্তি থাকে –এটা সহ্য করা যাবে না। এর চিকিৎসার জন্য কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ-কড়ি দাবী করবে, আমি

তাকে তাই দিয়ে দেব। এমনকি পুরা রাজত্বও যদি দাবী করে, আমি তাকে তাই দিয়ে সর্বসান্ত হয়ে যাব। সাধক বাহলূল (রহ.) এবার বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন! এর মাধ্যমে আমি এই সুক্ষ্ম বাস্তবতাই তুলে ধরতে চাই যে, আপনার এই গোটা রাজত্বও এক গ্লাস পানি পান করা এবং বের করার সমতূল্য নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গোটা রাজত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। বিনে পয়সায় পানি পাচ্ছেন, পান করছেন আবার বিনে পয়সায়ই তা বের হচ্ছে। এজন্য কোনরূপ মূল্য পরিশোধ কিংবা পেরেশানী ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত করতে হয় না।

বিস্‌মিল্লাহর মাধ্যমে নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান

যা হোক! মহান আল্লাহ তা'আলা এ চিরাচরিত নেযাম মানব জাতিকে বিনামূলে প্রদান করেছেন। কেননা কোনও মানুষ এর পেছনে পয়সা খরচ করে নি। অতএব কারণে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পড়ার নিদের্শ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর চিরন্তন কুদরত ও ব্যবস্থাপনার দিকেই আহবান করা হচ্ছে। এভাবে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সুমহান নেয়ামতের স্বীকৃতি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই পানি পান করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না যদি এর পেছনে আপনার কুদরতের ব্যবস্থাপনা না হত! এমন কি আমাদের হাত পর্যন্ত পৌছুতও না। আপনি কেবলই নিজ অনুগ্রহ-অনুকম্পায় এ পানি আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিলেন।

যখন এই পানি যখন আপনিই আমাদের হাত পর্যন্ত পৌছালেন, তখন হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছেই এই আবেদন ও দু'আ করি, যে পানি আমরা পান করছি, দেহাভ্যন্তরে পৌছার পর তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয়, ক্ষতিকর ও অপকারী না হয়, রোগ-ব্যাধি না ছড়ায়। কেননা যদি এ পানিতে রোগ-জীবাণু থাকে তবে তা দেহের ভেতর বড় সমস্যা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এভাবে যদি দেহাভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে গন্ডোগল সৃষ্টি হয়, 'যেমন যকৃৎ এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল' তাহলে ঐ পানি দেহের ভেতর তো যাবে ঠিক কিন্তু সেখানে পরিষ্কার করা এবং নোংরা ও দূষিত পানি বাইরে ফেলার যে নিয়ম-পদ্ধতি রয়ছে তা ব্যাহত হবে। এজন্য আমরা পানি পান করার সময় দু'আ করি, হে আল্লাহ! এ পানির শেষফলও আপনি ভাল করুন।

মানুষের কিডনীর মূল্য

করাচীতে এক কিডনী বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। একবার আমার ভাই তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনারা মানুষের কিডনী এক জনের দেহ থেকে বের করে অন্য জনের দেহে সংযোগ করে দেন। কিন্তু বর্তমানে তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইর্ষনীয় উন্নতি লাভ করেছে। তদুপরি কোনও কৃত্রিম কিডনী কেন বানানো হয় না, যেন অন্য মানুষের কিডনী ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই দেখা না দেয়? তিনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন– প্রথম তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব উন্নতির পরও কৃত্রিম কিডনী তৈরী করা দুরূহ ব্যাপারও বটে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিডনীর ভেতর এত পাতলা ও সূক্ষ্ম এক চালনি লাগিয়ে দিয়েছেন, যে চালনি তৈরী করার মত কোনও মেশিন এখনও আবিষ্কার হয় নি। যদি ধরে নেওয়া হয়, এমন পাতলা ও সূক্ষ্ম চালনি তৈরী করার মত কোনও মেশিন আবিস্কার করে নেওয়া যাবে তথাপি এক মেশিন প্রস্তুত করার পেছনেই শত কোটি টাকা খরচ হয়ে যাবে। আর যদি শত কোটি টাকা ব্যয় করে এমন চালনি বানিয়ে নেওয়াও হয় তথাপি কিডনীর ভেতর এমন এক জিনিস রয়েছে যা প্রস্তুত করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তা হল, কিডনীর ভেতরে আল্লাহ তা'আলা এক বোধশক্তি রেখে দিয়েছেন।

মানুষের শরীরের ভেতর কতটুকু পরিমাণ পানি থাকা আবশ্যক এবং কতটুকু পরিমাণ পানি বাইরে ফেলা উচিৎ প্রত্যেক মানুষের কিডনী তাকে এ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। দৈহিক গঠন এবং ওযন অনুপাতে প্রত্যেক মানুষের কিডনী নিজ অবস্থা বিচারে এ ফায়সালা দেয় যে, কতটুকু পরিমাণ পানি তার দেহে থাকা চাই আর কতটুকু পরিমাণ পানি বাইরে ফেলা চাই। আর এ সিদ্ধান্তের শতভাগই সঠিক হয়। ফলে সে ঠিক ততটুকু পরিমাণ পানি শরীরে আটকে রাখে যতটুকু পারিমাণ প্রয়োজন পড়ে এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি প্রস্রাব আকারে বাইরে ফেলে দেয়। সুতরাং আমরা যদি শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে রাবার দিয়ে কৃত্রিম কিডনী প্রস্তুত করেও নেই তথাপিও আমরা তাতে দেমাগ বা বোধশক্তি সৃষ্টি করতে পারব না, যা মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের কিডনীতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

দেহাভ্যন্তরে আল্লাহ তা'আলার কুদরত

কুরআনে কারীম বারবার ঘোষণা দিয়েছে–

وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"তোমরা নিজেদের নফস তথা জান নিয়ে কি গবেষণা কর?"

(সূরা যারিয়াত-২১)

অর্থাৎ তোমাদের দেহে আমার অসীম কুদরত ও সর্বোচ্চ দর্শন-প্রজ্ঞার কি কারিগেরি কারখানা কাজ করে যাচ্ছে, এনিয়ে কখনও কখনও চিন্তা কর! এ কিডনীর শেষ ফলও আল্লাহ্ তা'আলারই কুদরাধিন রয়েছে, কতদিন পর্যন্ত এ কিডনী কাজ করবে এবং কোন দিন কাজ বন্ধ করে দেবে।

অতএব কারণে বিস্‌মিল্লাহর পয়গমও তা-ই। অর্থাৎ একদিকে এ কথা স্মরণ কর যে, এ পানি তোমাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌছল? অপর দিকে এই খেয়াল কর যে, এ পানি তোমাদের দেহের ভেতর সমস্যা সৃষ্টি না করে। রোগ জীবাণু না ছড়ায় বরং তা শারীরিক সুস্থতা ও বরকতের কারণ হয়। 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ার মাঝে এক দিকে আল্লাহ্ তা'আলারই অসীম কুদরত হিকমতে বালেগা ও পূর্ণপ্রজ্ঞার স্বীকৃতি হচ্ছে। অপর দিকে আমরা এর মাধ্যমে দু'আ ও দুরখাস্ত করছি, হে আল্লাহ্! আমরা যে পানি পান করছি তা দেহের ভেতর পৌছে যেন বিপদ ও বির্যয়ের কারণ না হয় বরং তা যেন শারীরিক সুস্থতা, সফলতা ও উপকারের কারণ হয়। পানি পান করার পূর্বে "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়ার পেছনে এই দর্শন লুকায়িত রয়েছে।

অতএব পানি পান করার সময় যখন এই দর্শন সামনে রাখবে তখন দেখবে, পানি পান করার মাঝে কি স্বাদ আর কি বরকত রয়েছে ? এভাবে পানি পান করা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পক্ষে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য করবেন এবং সাওয়াব ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

ভালোবাসা ও ভয় সৃষ্টি হবে

যখন পানি পান করার সময় এই দর্শন সামনে রাখবে তখন কি এর কারণে ঐ মহান সত্ত্বার সাথে ভালোবাস সৃষ্টি হবে না? তোমরা এ অনুভূতি নিয়ে পানি পান করলে অবশ্যই তোমাদের অন্তঃকরণে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। ফলে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি সৃষ্টি হবে। উপরন্তু এই ভয়-ভীতি যাবতীয় গুনাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে।

কাফির ও মুসলমানের পানি পানের মাঝে তফাৎ

একজন কাফির পানি পান করে কিন্তু সে উদাসীনতাসহ পানি পান করে, নিজের স্রষ্টা ও মালিককে স্মরণ করে না। পক্ষান্তরে একজন মুমিনও পানি পান করে কিন্তু সে বিশেষ এক অনুভূতি ও ধ্যান নিয়ে পানি পান

করে। যদিও এ নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরকেও দিয়েছে, মুমিনকেও দিয়েছেন কিন্তু তাদের একজন এমন মানুষ, যে পানি পান করার সময় শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর অপর জন এমন মানুষ, পানি পানের সময় যে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। এতদুভয়ের মাঝে তফাৎ তো কিছুটা হওয়াই চাই। অতএব মুমিন ব্যক্তির উচিৎ সে মনোযোগ সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ পানি পান করবে। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অনুভূতি নিয়ে ও স্বীকৃতি দিয়ে পানি পান করবে এবং বরকতের দু'আ করতঃ পানি পান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট দর্শনের গভীরতা উপলব্ধি করা এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين

কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ কেন পড়বে ?

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد-اعوذ بالله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (سورة البقرة)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصذق رسوله النبى الكريم ونحن على ذالك من الشهدين والشكرين والحمد لله رب العلمين

প্রিয় পাঠক!

কয়েকটি জুম'আর বয়ানে আদইয়ায়ে মাস্‌নূনা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। যেমন আমি বলেছিলাম, অযুতে দুটি স্তর রয়েছে। প্রথমতঃ যাহেরী পবিত্রতা বা শরীরের বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা। দ্বিতয়তঃ বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। অর্থাৎ অযুর মাধ্যমে শুধুমাত্র অযুর অঙ্গ-প্রতঙ্গই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় না বরং অযুর মাধ্যমে এক বাতেনী পবিত্রতাও হাসিল হয়ে থাকে। এর বরকতে অযুকারী ব্যক্তির অন্তরে ও রূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক নূর সৃষ্টি করে দেন।

অযু দ্বারা বাতেনী নূর পয়দা করাও উদ্দেশ্য

যে ব্যক্তি মুসলমান নয়, সে যদি অযুর সমস্ত কাজকর্ম করে অর্থাৎ হাত ধোয়া, কুলি করা, নাক পবিষ্কার করা, মুখ ধোয়া, মাথা মাসাহ করা, পা ধোয় ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করে তবে সে ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন হবে ঠিক কিন্তু অযুর নূর এবং রূহানী বরকত ও ঝলক হাসিল হবে

না। কাজেই মুসলমানদেরকে নামাযের পূর্বে অযু করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে, এর উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাই নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অযুর মাধ্যমে তার বাতেন বা ভিতর এবং রূহানী বা আত্মিক নূর ও অদৃশ্য আলোকরশ্মি এবং বরকত হাসিল করা। তাই অযুর মাধ্যমে মানুষের ভেতর তথা অন্তর- আত্মাও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অযুর নিয়্যাত করবে

এই বাতেনী বা আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্য আবশ্যক হল, মানুষ অযু করার পূর্বে নিয়্যত করে নিবে। কেননা যদি কেউ অযুর নিয়্যত ব্যতীত হাত-পা ধৌত করে নেয়, তাতে যদিও অযু হয়ে যাবে ঠিক কিন্তু যেহেতু সে অযুর নিয়্যত করে নি অর্থাৎ মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেন নি যে, আমি এ অযুর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিদের্শ পালন করছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করছি, সেহেতু ঐ অযুর মাধ্যমে আত্মিক নূর, অদৃশ্য আলোকরশ্মি ও বরকত অর্জিত হবে না। সুতরাং সর্বপ্রথম অযুর নিয়্যত করে নেওয়া জরুরী।

অযুর পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়বে

দ্বিতীয়তঃ অযুর পূর্বে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও -এর উপর জোর তাগিদ দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা নাম নিয়ে অর্থাৎ 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে অযু করবে, সে অযু তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার জন্য অবলম্বন হয়ে যাবে। আর যদি কেউ 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া ছাড়া অযু করে ফেলে তবে তার এ অযুর দ্বারা কেবল শরীরের ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র হবে যেগুলো অযুতে ধৌত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, অযু করার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়াকে সুন্নাত বলার কারণ হল, যেন অযুর পূর্ণাঙ্গ উপকারিতা অর্জিত হয়ে যায়।

'বিস্‌মিল্লাহ্' বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নূর হাসিলের মাধ্যম

আপনি নিজেই হিসাব কষে দেখুন! যদি কোনও ব্যক্তি অযুর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে নেয় তাহলে এতে তার কি শ্রম যায়? এতে কি কষ্ট হয়? এতে কোথায় সময় ব্যয় হয়? কত পয়সা খরচ হয়? কিন্তু এই ছোট্ট একটি

আমল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় পবিত্রতা এবং নূর লাভের মাধ্যমে হয়ে যায়। কখনও কখনও বেখেয়ালী ও উদাসিনতা বশতঃ আমরা এ ধরণের বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। তাই অযু শুরু করার পূর্বে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এর উপর অতি যত্নবান হওয়া উচিত।

গুনাহ বিদূরীত হওয়ার কারণও অযু

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কোন মানুষ বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে অযু করে আর যখন সে নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করতে থাকে, তখন চেহারা দ্বারা যে সব সগীরা গুনাহ সে করেছিল, সবই তার চেহারা ধোয়ার দ্বারা বিলীন হয়ে যায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা দেখি, অযুর মাধ্যমে চেহারায় লেগে থাকা ধূলোবালি, ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে গেছে এবং চেহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু যে জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না তা বিশ্লেষণ করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তিনি বলেন– আমি লক্ষ্য করেছি, যখন তোমরা চেহারা ধৌত কর তখন তোমাদের চেহারা দ্বারা যত সগীরা গুনাহ হয়েছে তাও সাথে সাথে বিদূরীত হয়ে যায়। আর যখন তোমরা হাত ধৌত কর তখন তোমাদের নিজ হাতে কৃত যত সগীরা গুনাহ আছে সবই বিদূরীত হয়ে যায়। যখন তোমরা মাথা মাসাহ কর তখন তোমাদের মাথা দ্বারা কৃত যত সগীরা গুনাহ রয়েছে সবই তৎসঙ্গে বিদূরীত হয়ে যায়। যখন তোমরা কান মাসাহ কর তখন কান দ্বারা কৃত সগীরা গুনাহও বিদূরীত হয়ে যায়। আর যখন তোমরা পা ধৌত কর তখন পা দ্বারা যেসব গুনাহের দিকে হেটে গেছ, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তা-ও ক্ষমা করে দেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন কোন মানুষ অযু থেকে ফারেগ হয় তখন সে গুনাহ থেকে পুতপবিত্র হয়ে যায়।

কেবল সগীরা গুনাহই মাফ হয়

কিন্তু এই হাদীসে যেসব গুনাহের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা রয়েছে তা কেবলই সগীরা গুনাহ। কেননা কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব গুনাহ হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন, কোন ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে তাহলে ঐ ব্যক্তি থেকে তার হক ক্ষমা করানোর পূর্বে এর মাফ পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ,

প্রত্যেক অযুর সময়ই তোমাদের সগীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয়ে থাকে। এদিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّأتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا

অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাক তবে তোমাদের যেসব সগীরা গুনাহ রয়েছে তার কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ স্বয়ং আমিই করে দেব এবং সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা–৩১)

অন্য এক আয়াতে সগীরা গুনাহ্ ক্ষমা করার ব্যাপারে একটি নীতি বর্ণনা করেছেন– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নিশ্চয় নেক ও পুণ্যের কাজ সগীরা গুনাহসমূহকে বিদূরীত করে দেয়।" (সূরা হুদ–১১৪)

যেমন, কোন সগীরা গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর অযু করে নিলে তবে ঐ সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে কিংবা কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যেতে থাকল তাহলে প্রতি কদমে এক একটা করে সগীরা গুনাহ মাফ হতে থাকে। যা হোক! আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন– আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ ক্ষমা করতে থাকব। শর্ত হল, তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে আল্লাহর নাম নিয়ে এবং নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণে মানুষ যখন অযু করে তখন এ অযুর মাধ্যমে শুধুমাত্র শরীরের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় না বরং এ অযুর দ্বারা তার ভেতরও পুতপবিত্র হয়ে যায়। এ অযুর কারণে গুনাহও মাফ হয়। অন্তরে নূর ও অদৃশ্য আলোকরশ্মি সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিৎ "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম " পড়ে অযু আরম্ভ করা।

'বিস্‌মিল্লাহ্' -এর উপকারিতা

হাদীস শরীফে আছে 'বিস্‌মিল্লাহ্'-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع

অর্থাৎ দুনিয়া-আখেরাতের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে শুরু না করা হয় তবে তা লেজ কাটা ও অসম্পূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কোনও মূল্য থাকে না। আর যদি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে কোনও কাজ আরম্ভ করা হয় তবে আল্লাহ তা'আলা সে কাজে বরকত দান করেন। এতে দ্বীন-ধর্মেরও মঙ্গল হয়; দুনিয়ারও মঙ্গল হয়।

'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়ার মাঝে কি হেকমত?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, "বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে কাজ শুরু করলে তা পূর্ণাঙ্গ হয় আর বিস্‌মিল্লাহ্‌ ছেড়ে কাজ শুরু করলে তা লেজকাটা ও অসম্পূর্ণ থাকে" ব্যাপারটা এমন কেন? অথচ আমরা দুনিয়ার কোন একটা কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া ছাড়া করে ফেলি এবং বাহ্যতঃ দেখি, সে কাজটা পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– সে কাজ লেজ কাটা ও অসম্পূর্ণ থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়ার উপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, যদি সে কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া ছাড়া করা হয় তবে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যই হয় না। যেমন, আপনি কোনও হালাল প্রাণী যবাহ করলেন কিন্তু যবাহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়লেন না।

এখন কোনও বিলেক তাড়িত ও আবেগ প্রবণ লোক বলতে পারেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' না পড়ার কারণে প্রাণীর মাঝে কি পার্থক্য সৃষ্টি হল? যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়ে যবাহ করা হত তখনও এর তিনটি রগ কাটা হত আর এখন 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পড়া ব্যতীত যবাহ করার সময়ও ঐ রগ তিনটিই কাটা হয়েছে এবং রক্তও ততটুকুই প্রবাহিত হয়েছে। তাছাড়া শরী'আত কোনও প্রাণী যবাহ করার যে বিধান দিয়েছে তার উদ্দেশ্যও তো এটাই। অর্থাৎ প্রাণীর দেহে রক্ত আটকে থেকে যেন গোশতের মধ্যে কোন সমস্যা বা জীবাণু সৃষ্টি না করে এবং সে গোশত মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্য তো বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়ে যবাহ করার দ্বারাও হাসিল হয়ে গেছে। তখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়ার কারণে নতুন আবার কী ক্ষতি হল?

ঐ প্রাণী হালাল নয়

বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া ব্যতীত যবাহকৃত প্রাণীর ব্যাপারে কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ -

অর্থাৎ যেসব প্রাণীর উপর (যবাহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা কখনও ভক্ষণ করো না। আর এমন প্রাণী ভক্ষণ করা ফাসেকী বা বড় গুনাহ। (সূরা-আন'আন–১২১)

অর্থাৎ এমন প্রাণী ভক্ষণ করা তেমনই গুনাহ্‌ যেমন গুনাহ মদ পান করা, শূকর খাওয়া, যিনা করা। এভাবে যবাহের পরও বাহ্যতঃ এসব প্রাণী

সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই বটে। এর সমস্ত রগই কাটা হয়েছে। রক্তও প্রবাহিত হয়েছে। শুধুমাত্র যবাহ করার সময় বস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয় নি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বস্‌মিল্লাহ্ না পড়ার দরূন ঐ প্রাণীর উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল? যদি বস্‌মিল্লাহ্ পড়া হত তবে কি এ বিস্‌মিল্লাহর প্রতিধ্বনি প্রাণীর কর্ণকুহরে পৌঁছে যেত? না কি এ বিস্‌মিল্লাহ্ কোন যাদুমন্ত্র যে, তা পড়ার কারণে ঐ প্রাণী হালাল হয়ে যায়?

যবাহ্ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার নিগুঢ় তথ্য

বস্তুতঃ আল্লাহ মহীম যবাহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার হুকুম করে মানব জাতিকে এক নিগুঢ় বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। তা হল, একটু গভীরভাবে চিন্তা কর দেখ, যে প্রাণীকে তোমরা যবাহ্ করছ, এরও তো তোমাদের মত জান রয়েছে। আমি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছি এবং এদেরকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের যেমন প্রাণ আছে, এদেরও প্রাণ আছে। প্রাণী হওয়ার বিবেচনায় তোমরা যেভাবে চাও, তোমাদের কষ্ট না হোক, কেউ তোমাদের জখম না করুক অনুরূপভাবে এসব প্রাণীরাও তাই চায়; তার কোন কষ্ট না হোক, কেউ তাকে জখম না করুক।

তোমরা যেভাবে জীবিত থাকতে চাও, মরতে চাও না এবং সব সময় তোমরা মৃত্যুর আশঙ্কা কর; ভয় পাও তদ্রূপ এসব প্রাণীজগতও চায়, জীবিত থাকি, মৃত্যু না আসে এবং তারাও মৃত্যুকে ভয় করে। এসব প্রাণীও আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। তিনি এদের ভেতরেও জান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের গলদেশে ছুরি চালিয়ে যবাহ্ করে তোমাদের ভক্ষণ করতে চায় তবে তোমাদের কি পরিমাণ খারাপ লাগবে? কত কষ্ট লাগবে এবং এটাকে তোমরা নিজের উপর কত বড় জুলুম ও অন্যায় মনে করবে?

কেন তোমরা প্রাণীদের মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দাও?

অতএব কারণে তোমরা নিজেরা যবাহ্ হওয়াকে তো জঘন্য মনে কর। নিজের মৃত্যুকে তো তোমরা অপছন্দের ও নিন্দনীয় মনে কর। অথচ আমারই কত সৃষ্টিজীবের গলায় প্রতিনিয়ত ছুরি চালিয়ে তাকে যবাহ্ করে তার গোশত খাও। কখনও তোমাদের এ অনুভূতি জাগে না, আমি যে সৃষ্টিজীবরে উপর জুলুম করছি তারও তো জান আছে! কিন্তু আমি নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য এর গলায় ছুরি চালিয়ে একে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিচ্ছি। একটু ভেবে দেখ, তুমি এটা কী কাজ করতে উদ্ধত হয়েছ? নিজের আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এক সৃষ্টিজীবকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিচ্ছ?

এ প্রাণী তোমাদের জন্য সৃষ্ট

উপরিউক্ত কাজ যদি হালাল হয় তবে তা মাত্র একটি কারণেই হালাল। আর তা হল, যে স্রষ্টা এসব প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ঐ স্রষ্টাই তোমাদেরকে এভাবে বিভক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ জানোয়ার যদিও আমারই সৃষ্টিজীব কিন্তু আমি এগুলোকে অপর এক সৃষ্টিজীবের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ এই বকরী, দুম্বা, গাড়ী, উট, এসবই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যেহেতু এরা মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হবে সেহেতু তোমরা প্রত্যেহ এদের গলায় ছুরি চালিয়ে এদের খাও। পরুন্ত এ কাজটাকে কোন জুলুমও মনে কর না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا –

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে, হে মানুষ! আমি (সবই) তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছি। জানোয়ার যবাহ করে খাওয়া তোমাদের জন্য জায়েয কিন্তু যবাহ কর্ম সম্পাদনের সময় এই নিগুঢ় বাস্তবতা স্বীকার কর যে, প্রাণী যবাহ করা আইনত জুলুম ও অন্যায় ছিল কিন্তু আমার স্রষ্টা আমার জন্য এ হেন জুলুমও জায়েয করে দিয়েছেন। আমার কল্যাণে আমার মালিক এটাকে আমার জন্য হালাল করে দিয়েছেন নতুবা তা আমার জন্য হালাল ছিল না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এ স্বীকৃতি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রাণী তোমার জন্য হালাল হবে না।

বিস্‌মিল্লাহ্ -এর স্বীকারোক্তি

সুতরাং তোমরা যখন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কিংবা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার্' পড়ে জানোয়ার যবাহ করছ তখন জেনে রাখ, তোমাদের মুখে আবৃত্ত ঐ কালিমা কোন যাদুমন্ত্র নয় বরং তোমরা এর মাধ্যমে এক সুক্ষ্ম বাস্তবতা স্বীকার করে নিচ্ছ। অর্থাৎ আমি এ জানোয়ারকে ঐ আল্লাহ তা'আলার নামে যবাহ করছি, যিনি এ সৃষ্টিজীবকে আমার জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং হালাল করে দিয়েছেন। আর সাথে সাথে তোমরা যখন 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার' পড়লে তখন তোমরা এর মাধ্যমে একথাও স্বীকার করে নিলে যে, আল্লাহই সব চেয়ে বড়। আর যেহেতু তিনিই

সবচেয়ে বড় সেহেতু কোন্ সৃষ্টি কি কাজের জন্য সৃজিত হয়েছে, তিনিই এ সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার রাখেন। এ স্বীকৃতি প্রদানের পর যখন তোমরা জানোয়ারের গলায় ছুরি চালাবে তখন সে জানোয়ার তোমাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তোমরা উদাসীনতা বশতঃ আল্লাহ তা'আলার এই নেয়ামতের স্বীকারোক্তি ছাড়াই তার গলদেশে ছুরি চালাও তবে এর উদ্দেশ্য দাঁড়ায়, তোমরা এ জানোয়ার হালাল হওয়ার শর্ত পূরণ করলে না। অতএব কারণে ঐ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল নয়। কেননা এ প্রাণী নিজে নিজে মৃত্যু বরণকারী প্রাণীর মতই।

এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই। অথচ এই জানোয়ারের রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেছে। ডাক্তারও এ প্রাণী খাওয়ার ব্যাপারেই রিপোর্ট দেবেন। বলবেন, এ প্রাণী খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কুরআনে কারীমের ফাতওয়া হবে ভিন্ন। কেননা তোমরা এ প্রাণীর উপর আল্লাহর নাম নাও নি। অতএব এ প্রাণী খাওয়া হালাল নয়। 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ার দ্বারা একে তো এই স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে।

বিস্‌মিল্লাহ্ -এর আরও এক দর্শন

দ্বিতীয়তঃ বিস্‌মিল্লাহ্ এর দ্বারা আরও এক তথ্য প্রকৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়। তা হল, আল্লাহ তা'আলা এই জানোয়ারকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণেই তোমদের জন্য তা খাওয়া হালাম। কিন্তু বলতো তোমাদের মাঝে কোন্ সে বিহগের পালক রয়েছে, যদ্দরুন আল্লাহ তা'আলা এ গোটা সৃষ্টিজগত তোমদের সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? অথচ তোমরা গাছের পাতা খেয়েও জীবন ধারণ করতে পার, পত্র-পল্লব খেয়েই তোমদের ক্ষুধা মিটে যায়। শস্য সবজীতেও মিটে যায়, যমীন থেকে উৎপন্ন ফসলেও মিটে যায়। তদুপরি তোমাদের জন্য রুচি সম্মত এবং গুণগত মানের খাদ্য সরবরাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা এত বড় জীব সৃষ্টি করে দিলেন। পাশাপাশি এদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়ে তোমাদের চাহিদা মত রুচি সম্মত খাবার তৈরী করার অনুমতিও দিলেন।

জীবনও নাও, পুণ্য লুফে নাও

জনৈক ব্যক্তি বকরীর ভাষায় চমৎকার একটি পংক্তি আবৃত্তি করেন। অর্থাৎ মানুষ প্রাণী যবাহ করে এবং কুরবানীও করে। এতে যেন সে জানোয়ার যবাহ করে আবার উল্টো সাওয়াবও লুফে নেয়।

وہی ذبح بھی کرے ہے + وہی لے ثواب الٹا۔

সে যবাহও করে আবার উল্টো সাওয়াবও লুফে নেয় আবার অতৃপ্ত স্বাদও মিটায়। এ প্রসঙ্গে বকরীর ভাষায় জনৈক কবি সুন্দর একটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন। বকরী যেন নিজের ভাষায় বলছিল–

نسلوں کو نگل لیا تو نے + پھر بھی نہیں تیری اشتہاء کم۔

বংশধর তুমি নষ্ট করে দিলে এরপরও তোমার চাহিদা মিটল না। হিসাব করে দেখ, একজন মানুষ জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কত বকরী এবং গাভী খেয়ে ফেলে! কত বংশধারা গলধঃকরণ করে অথচ এরপরও ক্ষুধা হ্রাস পায় না!

এক মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি

যা হোক! আল্লাহ তা'আলা এসব জানোয়ারের উপর তোমাদের এই শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, তোমাদের অতৃপ্ত স্বাদ আস্বাদনের নিমিত্ত এগুলোকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তোমাদের মাঝে এমন কি রয়েছে, যার কারণে জানোয়ারগুলো তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে? এর বিপরীত হুকুম কেন দেওয়া হল না? গরু, মহিষকে কেন বলা হল না, চিরে ফেঁড়ে মানুষ খেতে। এরা তো তোমাদের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী। যদি গরু-মহিষের মোকাবেলায় অধিক সুস্থ-সবল কোন মানুষ এনে দাঁড় করানো হয় তথাপি গরু-মহিষ মানুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী ও বলবান হবে। এতদসত্ত্বেও বলবানকে বলা হচ্ছে, এই দুর্বল মানুষের জন্য তোমরা কুরবান হয়ে যাও। এর কারণ কি? কেন মানুষকে জানোয়ারের উপর শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে?

এই শ্রেষ্টত্ব দানের পেছনে এছাড়া কোনও কারণ নেই, বস্তুতঃ মানুষকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য কুরআনে কারীমে নির্দেশিত হয়েছে এভাবে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত-৫২)

অতএব মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-আনুগত্য করে তাহলে সে নিশ্চিত এর হকদার হবে। সে অন্য সৃষ্টিজীব দ্বারা কাজ নেবে এবং তার

থেকে ফায়দা হাসিল করবে ও স্বাদ আস্বাদন করবে। কিন্তু মানুষ যদি নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার অন্য সৃষ্টি জীবের গলায় ছুরি চালানো এবং তাকে নিজের চাহিদা ও রুচি মত ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।

বিস্‌মিল্লাহর দ্বারা দুটি তথ্য প্রকৃতির স্বীকারোক্তি

যখন মানুষ কোন জানোয়ারকে যবাহ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে তখন এর দ্বারা দুটি বাস্তবতার স্বীকারোক্তি হয়ে যায়। প্রথমতঃ তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আমার জন্য জানোয়ারকে হালাল করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমার মত এক প্রাণীকে যবাহ্ করে ভক্ষণ করার অধিকার আদৌ আমার ছিল না। কারণেই আমি প্রথমতঃ তার বড়ত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং তার হিকমত-প্রজ্ঞা ও কুদরতের পরিব্যাপ্তীকে স্বীকার করছি। 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ার মাধ্যমে ঐ শাশ্বত সত্যের স্বীকৃতি হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রাণী আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তা এমনিতেই হালাল করে দেননি বরং এ হালাল করার পেছনে আমার জীবনের কোনও মহৎ উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে। সে উদ্দেশ্য অবশ্যই আমাকে পূর্ণ করতে হবে। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার' বলে যবাহকারী এ দুটি বাস্তবতারই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি একথা সব সময় স্মরণ রেখে আমল কর, তাহলে তার জীবন পরিপাটি হয়ে যাবে।

যা হোক। কোন প্রাণী যবাহ্ করার সময় তার উপর বিসমিল্লাহ' পড়ার পেছনে যে দর্শন লুকায়িত রয়েছে তা আমি সবিস্তার আলোচনা করেছি। এ আলেঅচনা আমি আপনাদের সম্মুখে 'প্রাণী' এর উপমা পেশ করেছি মাত্র নতুবা দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজ-কর্মের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু কর। আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়াই যে কাজ আরম্ভ করা হয় সে কাজ লেজ বিহীন ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বরকত শূন্য হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অযুও বিসমিল্লাহ্' পড়ে আরম্ভ কর। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এই নিগূঢ় বাস্তবতা বুঝা ও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

ভাল কাজে
দেরী করতে নাই

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد نا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله- صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبا رك وسلم تسليماكثيرا كثيرا-أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الر جيم. بسم الله الر حمن الر حيم:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

امنت با لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذالك من الشهدين والشكرين والحمد لله رب العلمين

ভাল কাজে তড়িগড়ি করা

আল্লামা নববী (রহ.) স্বীয় কিতাবে باب المبادرة الى الخيرات শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার অর্থঃ মানুষ যখন নিজের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, মহান আল্লাহ তা'আলার অপার মহীমা ও তার অসীম কুদরত, গভীর দর্শন-প্রজ্ঞা নিয়ে গবেষণা করবে, তখন এ চিন্তা-ভাবনার ফলে আল্লাহ তা'আলার ইবদাতের প্রতি তার মন-প্রাণ আকৃষ্ট হবে। অন্তর শিহরিত হবে, আন্দোলিত হবে। যে একচ্ছত্র মালিক এ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, যেঁ সত্ত্বা আমার উপর এত নেয়ামত ও পুরস্কার অবতীর্ণ করলেন, যে আল্লাহ আমাকে তার অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহের বৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত অবগাহন করাচ্ছেন, সেই মহামহীম সত্ত্বারও কিছু হক, কিছু অধিকার ও কিছু পাওনা আমার উপর আছে কী? যখন এই অনুভূতি ও শিহরণ অন্তরে জাগ্রত হবে তখন আমার কি করণীয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা নববী (রহ.) উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। অর্থাৎ যখনই আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত হবে, মন শিহরিত হবে, তার আনুগেত্যের জন্য প্রাণস্পন্দন জাগ্রত হবে, হৃদয় আন্দোলিত হবে এবং কোন সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ করার সুযোগ এসে যাবে তখন একজন মুমিন বান্দার কাজ হল, অতি দ্রুত ঐ

সাওযাব ও পুণ্যের কাজ করে ফেলা। ঐ কাজে আদৌ কালবিলম্ব না কর। مبادرة অর্থও তা-ই। অর্থাৎ কোনও কাজ দ্রুত করে ফেলা, টালবাহানা না করা এবং আগামী দিনের জন্য রেখে না দেওয়া।

নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা

আল্লামা নববী (রহ.) সর্বপ্রথম কুরআনের এ আয়াত আনেন–

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

"সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে মহামহীন আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন– আপন প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের পথে দ্রুত অগ্রসর হও, দৌড়ে যাও। যার সীমানা আকাশ-যমীন সমপরিমাণ (বরং তদপেক্ষা আরও বেশি দ্রুত) আর তা মুত্তাকী বা আল্লাহ্ ভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান- ১৩৩)

مسارعة এর অর্থ দ্রুত থেকে দ্রুত কোনও কাজ করা। অপরের আগে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা করা। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– فاستبقوا الخيرات অর্থাৎ ভালো এবং সাওয়াবের কাজে প্রতিযোগিতা কর, দৌড়াও। এক কথায় যখন কোনও নেক কাজের ইচ্ছা ও স্পৃহা মনে জাগ্রত হবে তখন তা পালনে কালবিলম্ব করো না, পিছু হটিও না।

শয়তানী প্ররোচনা

শয়তানের প্ররোচনা প্রতিটি মানুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কাফিরদের বেলায় এক রকম আবার মুমিন-মুসলমানদের বেলায় আরেক রকম। মুমিন বান্দার অন্তরে শয়তান এই ওসওয়াস ও ধাঁধা লাগাবে না যে, এই নেক ও পুণ্যের কাজ করো না, এটা নিন্দনীয় কাজ, খারাপ কাজ। সরাসরি বা সোজাপথে মুমিন-মুসলমানকে ধোঁকা দেবে না। কেননা শয়তান ভাল করে জানে, এ লোক ঈমানদার হওয়ার কারণে সে কোনও সাওয়াবের কাজকে নিন্দনীয় বা খারাপ মনে করতে পারে না। তাই শয়তান মুমিনদেরকে একটু ভিন্নভাবে প্ররোচিত করে বলে– নামায পড়া, রোযা রাখা বা অমুক সাওয়াবের কাজ করা তো ভাল কথা, তা তো অবশ্যই করা চাই, তবে ইনশাআল্লাহ আগামী দিন থেকে শুরু করা যাবে। পরের দিন বলবে, আচ্ছা ভাই আগামী দিন থেকে শুরু করা যাবে। এভাবে আগামী দিন তার গোটা জীবনে কখনও আসবে না। অথবা কোনও আল্লাহ ওয়ালা

লোকের কথায় তার মনে দাগ কেটেছে। ভাবছে, তিনি তো ঠিক কথাই বলেছেন, এর উপর আমল করা চাই, জীবনে আমূল পরিবর্তন আনা চাই, গুনাহ ছাড়া চাই, নেক কাজ করা এবং সৎ পথে চলা চাই তবে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই এর উপর আমল শুরু করব। যখন সে এভাবে শিথিল করে দিল, আমল স্থগিত করে দিল তখন জীবনে কখনও এ কাজের সুযোগ আসবে না।

প্রিয়জীবন থেকে কল্যাণ লুফে নাও

এভাবেই জীবনের সময় রয়ে চলে। প্রিয় জীবন কেটে যায়। কেউ আঁচ করতেও পারে না যে, তার বয়স কত? পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে– ভাল কাজ আগামী দিন পর্যন্ত মূলতবী করো না, বিলম্ব করো না। যে স্পৃহা আজ জাগ্রত হল তার উপর তৎক্ষনাত আমল করে নাও! কে জানে, আগামী দিন পর্যন্ত এই স্পৃহা বহাল থাকবে কি না? প্রথমতঃ আগামী দিন পর্যন্ত তুমিই বাঁচবে কি না এ-ও জানা নেই। আর যদি তুমি জীবিত থেকেই যাও তথাপি আজকের নেক জয্‌বা আগামী দিনও বহাল থাকবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আর জয্‌বা বাকী থাকলেও আমল করার সময়-সুযোগ হবে কি না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতএব যখন যে আমলের উৎসাহ জাগল তখনই আমল করে ফেল।

নেক কাজের উৎসাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত এক মেহমান

এ নেক কাজের উৎসাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত এক মেহমান। এই মেহমানের আদর-আপ্যায়ন, এ মেহমানের মনোরঞ্জন এখনই করে ফেল। এর খাতির-যত্ন হচ্ছে এর উপর আমল করা। মনে কর, নফল নামায পড়ার আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হল আর তুমি ভাবলে, এ তো ফরয-ওয়াজিব নয়। যদি না পড়ি কোনও গুনাহ তো আর হবে না। ব্যাস, ছেড়ে দাও। তবে তুমি ঐ মেহমানের অবমূল্যায়ন করলে যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমার ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। যদি তুমি তৎক্ষনাত এর উপর আমল না কর তবে তুমি পিছনে পড়ে যাবে। আর একথাও জানা নেই, এই মেহমান পুনরায় আসবে কি না? হতে পারে সে আসা বন্ধ করে দিবে। কেননা ঐ মেহমান ভাবতে পারে, এ লোক তো আমার কথা মানে না, আমার অবমূল্যায়ন করে, আমার খাতির-যত্ন করে না। আমি আর তার কাছে যাব না।

যা হোক! স্বাভাবিকভাবে তো কোনও কাজে তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয়। কিন্তু যখন অন্তরে কোনও নেক কাজের উৎসাহ জাগ্রত হয়, নেক কাজ করার স্পন্দন জাগে তখন তা দ্রুত করে নেওয়াই উত্তম।

সময়-সুযোগের অপেক্ষায় থেকো না

নিজের ইসলাহ বা সংশোধনের চিন্তা-ফিকির যদি মনের গহীনে ঢেউ তোলে, অনুশোচনা আসে যে, জীবন তো এভাবেই বয়ে চলেছে, নিজের ইসলাহ করা চাই, আমল-আখলাক শুধরানো চাই। কিন্তু পাশাপাশি এ-ও ভাবলে, যখন অমুক কাজ থেকে অবসর পাব তখন নিজের ইসলাহ শুরু করব। এ সুযোগের অপেক্ষায় জীবনের যে মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে তা কখনও আর ফিরে আসার নয়।

কাজের উপযুক্ত সময়

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (আল্লাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) বলেন, যে কাজ সময়-সুযোগের অপেক্ষায় মূলতবী করলে তা বিলম্বিত হয়ে গেল, তা আর কখনও হবে না। কেননা, স্বয়ং তুমিই তা মূলতবী করে দিলে। কাজের নিয়ম হল– দুটি নেক কাজের মাঝে তৃতীয় আরেকটি নেক কাজ ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ যে দুটি নেক কাজ তুমি পূর্ব থেকে করছিলে, এখন তৃতীয় আরেকটি নেক কাজের আগ্রহ জাগল। যদি ঐ দুটি কাজের মধ্যে তৃতীয় কাজটিও জরদস্তি ঢুকিয়ে দাও তাহলে ঐ তৃতীয় কাজটিও হয়ে যাবে। আর যদি ভাব, ঐ দুটি কাজ থেকে অবসর নিয়ে পরে তৃতীয় কাজটি করব তাহলে ঐ তৃতীয় কাজটি আর হবে না। কিংবা এ কাজটি হয়ে গেলে পরে ঐ কাজটি করার এ পরিকল্পনা নিলে তাহলে জেনে রেখ, তা আর হচ্ছে না। এসবই বিলম্বিত ও স্থগিত করার কথা। শয়তান স্বাধারণতঃ এভাবেই প্ররোচিত করে থাকে।

নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা মন্দ নয়

অতএব ভাল কাজে তড়িগড়ি করা, অগ্রগামী হওয়া কুরআন সুন্নাহর দাবী। আল্লামা নববী (রহ.) এ কারণেই "ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করা" শিরোনামে অনুচ্ছেদটি রচনা করেছেন। আল্লামা নববী (রহ.) এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক مبادرة তথা দ্রুত করা। দ্বিতীয়ত مسابقة তথা প্রতিযোগিতা ও মোকাবেলা করা একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা। এ মোকাবেলা ও প্রতিযোগিতা নেক কাজে পছন্দনীয় ও প্রশংসিত। অন্য কোন ব্যাপারে একে অপর থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা

করা নিন্দনীয়। যেমন, অর্থ-কড়ি সঞ্চয় করা, মান-ইজ্জত, যশ-খ্যাতি, জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি হাসিল করা, পদমর্যাদা লঅভ ইত্যাদি সব কাজকর্মেই অগ্রামীতার প্রচেষ্টা, মোহ ও প্রতিযোগিতা বড় নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ।

পক্ষান্তরে নেক কাজে একে অপরের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টা ও স্পৃহা বড় প্রশংসিত কাজ। স্বয়ং কুরআনে কারীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে– فاستبقوا الخيرات "পুণ্যকর্মে বা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টা কর।" কোন ব্যক্তিকে তুমি দেখলে, মাশাআল্লাহ সে ইবাদত-আনুগত্যে বড় নিমগ্ন, গুনাহ থেকে বাঁচতে বদ্ধপরিকর। এখন তুমিও তার চেয়েও অগ্রগামী হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাও এবং সাধনা কর। এ প্রতিযোগিতা করা দোষণীয় বা নিন্দনীয় নয়।

দুনিয়াবী আসবাবপত্রে প্রতিযোগিতা করা জায়েয নয়

বর্তমানে সব ব্যাপার উল্টো হয়ে গেছে। এখন আমাদের গোটা জীবনই এক রকম প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতা চলছে কিভাবে অধিক পরিমাণে অর্থ-কড়ি সঞ্চয় করা যায়। একজন এই পরিমাণ টাকা-পয়সা জমা করেছে, আমি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি জমা করব। একজন এমন বাসভবন নির্মাণ করেছে, আমি তদপেক্ষ উন্নতমানের বাসভবন নির্মাণ করব। একজন এমন গাড়ী কিনেছে, আমি তদপেক্ষা দামী গাড়ী কিনব। একজন এমন আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ফেলেছে, আমি তার চেয়ে মূল্যবান আসবাবপত্র সংগ্রহ করব। সমগ্র জাতি আজ এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এখানে হালাল-হারামের তোয়াক্কা পর্যন্ত করে না।

কারণ, মাথায় যখন এ জযবা চেপে গেছে যে, দুনিয়ার বিষয়-সম্পত্তি ও আসবাবপত্রে অন্যের চেয়ে অগ্রগামীতা চাই, প্রাচুর্য চাই, তখন হালাল মাল ও বৈধ সম্পদের দ্বারা তো অগ্রসর হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। কাজেই হারামের দিকে ঝুকে পড়তে হয়, অবৈধ পথে কালো টাকার ধান্দায় পড়তে হয়। আর তখনই ধন-সম্পদের মাঝে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের সংমিশ্রণ ঘটে একাকার হয়ে যায়। যে সব ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে দোষণীয় ছিল, আজ ঐ সব কাজ কর্মেই প্রতিযোগিতা চলছে। একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার পেছনে পড়েছে। আর যে সব ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ও একে অন্যের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ার কথা ছিল, সে ক্ষেত্রে জাতি আজ পিছনেই পড়ে রয়েছে।

তাবুক যুদ্ধে হযরত উমর ফারূক (রাযি.) ও হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর প্রতিযোগিতা

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) প্রতি লক্ষ্য করুন! তাবুক যুদ্ধের সময় তাঁরা কী করেছেন? তাবুকের যুদ্ধ ছিল বড় কঠিন এক যুদ্ধ। ধৈর্য পরীক্ষার এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্ভবত আর কখনও সৃষ্টি হয় নি। তখন ছিল তীব্র গরমকাল। আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি ঝরছে। যমীন থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড লু-হওয়া। প্রায় বারোশ' কিলোমিটার দীর্ঘ মরুভূমি সফর করতে হবে। আবার তখন ছিল খেজুর ঘরে তোলার মৌসুম। যার উপর নির্ভর করত মদীনাবাসীর পূর্ণ বছরের জীবিকা। অপর দিকে মুসলমানদের হাতে উল্লেখযোগ্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই; অর্থ-কড়িও নেই। এমনই এক সময় তাবুক যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হল।

প্রত্যেক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ঘোষণা হল, সবাইকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– এখনই যুদ্ধের উপযুক্ত সময়। এদিকে সাওয়ারির অভাব, ঘোড়া ও উটের প্রয়োজন, টাকা-পয়সার অনেক প্রয়োজন। কাজেই এ যুদ্ধে সকল মুসলমানদেরকেই যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ চাঁদা প্রদান করতে হবে। আর এ যুদ্ধে যে চাঁদা দেবে, তার জান্নাতের দায়িত্বভার আমি নিলাম। তখন সকল সাহাবায়ে কিরাম নিজ সামর্থানুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিতে লাগলেন। সকলেই চাঁদা এনে এক স্থানে জমা করতে লাগলেন। ফারুকে আযম হযরত উমর (রাযি.) বলেন– আমি ঘরে গেলাম এবং আমার যত গৃহসামগ্রী ও টাকা-পয়সা ছিল, তার অর্ধেক নবীজীর দরবারে নিয়ে এলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আজ হয়ত আমি হযরত আবু বকর (রাযি.) অপেক্ষা অগ্রগামী হতে পারব। "আমি তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাব" এই যে আগ্রহ ও জয্বা সৃষ্টি হচ্ছে এরই নাম "মুসাবাকাত্ ইলাল্ খাইর"।

কখনও তাঁর (উমর রাযি. -এর) অন্তরে এই স্পৃহা জাগেনি যে, আমি হযরত উসমান (রাযি.)-এর চেয়ে অর্থ-কড়ির দিক দিয়ে আগে বেড়ে যাব। কখনও এ আগ্রহ জাগেনি, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-এর কাছে প্রচুর অর্থ-সম্পদ রয়েছে, আমার তার চেয়েও অনেক বেশি চাই। কিন্তু এ আগ্রহ ও জয্বা জেগেছে যে, সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) কে আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের যে স্থান দিয়েছেন, আমি তদপেক্ষা অগ্রগামী হব।

খানিক পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)ও এসে উপস্থিত হলেন এবং যা কিছু তার ছিল, সবই উজার করে দিলেন।

দুজাহানের সরদার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার প্রশ্ন করলেন– হে উমর! তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ? হযরত উমর (রাযি.) আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুরো সম্পত্তির অর্ধেক গৃহবাসীর জন্য রেখে এসেছি। আর অর্ধেক সম্পত্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দু'আ করলেন– আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দান করুন। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) কে প্রশ্ন করলেন– তুমি নিজের ঘরে কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার ঘরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। আর ঘরে যা কিছু ছিল, সবই নিয়ে এসেছি। হযরত উমর (রাযি.) বলেন– সেদিন আমি বুঝতে পারলাম, যদি জীবনভর অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই তবু হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর তুলনায় নেক কাজে আগে যেতে পারব না। (আবু দাউদ, হাদীস নং–১৬৭৮)

এক বেনযীর দৃষ্টান্ত

ফারুকে আযম হযরত উমর (রাযি.) একবার হযরত সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রাযি.) কে বললেন– আপনি যদি একটি কাজ করতেন তবে আমি বড় কৃতজ্ঞ হতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– কি কাজ? ফারুকে আযম (রাযি.) বললেন– আমার পুরো জীবনে যত নেক কাজ ও আমলে সালিহা আছে সে সব আপনি গ্রহণ করুন; আর ঐ এক রাতের আমল, যে রাত আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সূর গুহায় কাটিয়েছেন তা আপনি আমাকে দান করুন। ঐ রাতের আমল আমার পূর্ণ জীবনের সমস্ত আমলের চেয়েও বেশি।

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরামের জীবন-কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কোথাও এ বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় না যে, তারা কখনও এ ভাবনায় পড়েছেন, অমুক ব্যক্তি এত এত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে নিয়েছে, আমিও তদনুরূপ অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে নিব। অমুকের বাসভবন বড় বৈচিত্রময়, আমারও অনুরূপ বাসভবন হওয়া চাই। অমুকের যানবাহন খুব উন্নত, আমারও অনুরূপ পেতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের গোটা জীবনে আমলে সালিহা ও নেক কাজের প্রতিযোগিতাই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের কাজকর্ম আজ সবই সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। আমলে সালিহা ও সাওয়াবের কাজে অগ্রগামী হওয়ার কোনও গরয নেই। অথচ অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের পেছনে

সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম ছুটছি এবং একজন অন্যজন থেকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা-ফিকিরে হরদম পড়ে আছি।

প্রাণ সঞ্জীবনী অমর্ত্য সুধা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিস্ময়কর কথা বলেছেন, যা আমাদের জন্য প্রাণ সঞ্জীবনী অমর্ত্য সুধা স্বরূপ। তিনি বলেন– পার্থিব ব্যাপারে সব সময় নিজের তুলানায় নিচুদের প্রতি লক্ষ্য করবে। নিজের চেয়ে ছোটদের সাথে থাকবে। তাদের সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে। পক্ষান্তরে দ্বীন ও আখেরাতের ব্যাপারে নিজের তুলনায় উপরস্থদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাদের সাহচর্য গ্রহণ করবে। কেননা যখন পার্থিব ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেবে তখন যেসব নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনুগ্রহ করে দান করেছেন তার মূল্যায়ন করা হবে। ভাববে, এ নেয়ামত তো অমুক ব্যক্তির কাছে নেই অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। ফলে আত্মতুষ্টি জন্ম নিবে। কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং দুনিয়ার মোহ একেবারে কেটে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বীনী ব্যাপারে যখন নিজের তুলনায় উপরস্থদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে এবং ভাববে, অমুক ব্যক্তি তো দ্বীন-ধর্ম ও নেক কাজে আমার তুলনায় অগ্রগামী হয়ে গেছেন। তখন নিজের দুর্বলতা ও নিচুতার অনুভূতি জাগ্রত হবে এবং নেক আমলের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি লাভ করার চিন্তা-ভাবনা আসবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১২)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক কেমন প্রশান্তি লাভ করেছেন!

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, দক্ষ ফকীহ, ও বড় সাধক পুরুষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন– আমি জীবনের প্রাথমিক সময়টা বিত্তশালীদের সাথে কাটিয়েছি। আমি নিজেও ধনকুব ছিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধনবানদের সাথেই কাটাতাম। কিন্তু যখন আমি বিত্তবানদের সাথে ছিলাম তখন আমার চেয়ে অধিক বিষণ্ন আর কেউ ছিল না। কেননা যেখানেই যেয়ে দেখতাম, অমুকের বাড়ি ঘর আমার চেয়ে উন্নত, অমুকের যানবাহন আমার যানবাহন অপেক্ষা মূল্যবান, অমুকের পোশাক-পরিচ্ছদ আমার পোশাক-পরিচ্ছদ অপেক্ষা দামী। তাতে আমার অন্তর বিষণ্নতায় ছেয়ে যেত। ভাবতাম, আমি এসবের কিছুই পেলাম না অথচ তার সবই হয়ে গেল!

পরবর্তীতে যখন দুনিয়ার হিসেবে নিম্নবিত্তের লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করলাম এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে আরম্ভ করলাম, فاستراحت অর্থাৎ তখন আমি গভীর আত্মপ্রশান্তি লাভ করলাম। কারণ, যাকেই আমি দেখি, মনে হয় আমি তো বড় সুখ-স্বাচ্ছন্দেই রয়েছি। আমার পানাহার তার চেয়ে উন্নতমানের, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ তার চেয়ে বেশি দামী, আমার বাড়ি-ঘর তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, আমার সাওয়ারীও তার চেয়ে মূল্যবান। অতএব আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আমি বড় সুখ-শান্তিতেই আছি।

অন্যথায় কখনও আত্মতৃপ্তি পাবে না

এ সব প্রিয় নবীজীর কথা মত আমল করার বরকত ও সুফল। যে কেউ বড়লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, কখনও তার পেট ভরবে না। কখনও পরিতৃপ্তি আসবে না। কখনও চক্ষু জুড়াবে না। সব সময় মাথায় যতসব অসাধ্য সাধনের চিন্তা-ভাবনাই ঘুরপাক খাবে। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لو كان لإبن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان

"যদি কোন আদম সন্তানের এক স্বর্ণের উপত্যকা হস্তগত হয় তবে সে একথা বলবে, দ্বিতীয় আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা হস্তগত হয়ে যাক। আর যখন দুটি পেয়ে যাবে তখন বলবে, তৃতীয় আরেকটি পেয়ে যাই। আর এভাবেই এ দৌড়-ধাপের মাঝে জীবনায়ু ফুরিয়ে যাবে। কখনও প্রশান্তির ঠিকানায়, পরিতৃপ্তি এবং স্থিরতার মনজিলে পৌঁছুতে পারবে না।

অর্থ-কড়ির বিনিময়ে শান্তি কেনা যায় না

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন) বড় সুন্দর কথা বলতেন, যা হৃদয় অন্দরে গেঁথে রাখার মত। তিনি বলতেন– সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ এক জিনিস আর শান্তির উপায়-উপকরণ ভিন্ন জিনিস। উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সুখ-শান্তি আসা জরুরী নয়। শান্তি আল্লাহ তা'আলার মহান নেয়ামত, বড় দান। অথচ আজ আমরা বাহ্যিক আসবাবপত্রের নাম শান্তি ধরে নিয়েছি। প্রচুর অর্থ-কড়ি থাকলেই ক্ষুধার সময় কি তা ভক্ষণ করব? যদি পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন পড়ে তবে কি তা পরিধান করব? গরমের

সময় কি ঐ টাকা-পয়সা কাউকে শিতলতা বা ঠান্ডা বাতাস পৌঁছাবে? প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং এই টাকা-পয়সা না শান্তির জিনিস, না এতে তোমরা সুখ-শান্তি ক্রয় করতে পারবে!

যদি তোমরা টাকা-পয়সা দিয়ে শান্তির জিনিসপত্র ক্রয় করেও নাও, যেমন আরামের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে নিলে, দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করে নিলে, বৈচিত্রময় গৃহসামগ্রী ক্রয় করে নিলে তবেই কি শান্তি এসে যাবে?

স্মরণ রেখো! শুধুমাত্র এসব আসবাবপত্র মজুদ করলেই শান্তি আসা জরুরী নয়। কেননা, কত লোকের কাছে অঢেল ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ঐ বীর বাহাদুরের ঘুমের বড়ি সেবন করা ছাড়া তন্দ্রা আসে না।

কামরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, চাকর-বাকর কোনও কিছুর কমতি নেই তথাপি ঘুম আসছে না। এখন বল– শান্তির জিনিসপত্র সবই আছে অথচ ঘুম হল না, শান্তি পেল না? আর এক ব্যক্তি যার ঘরের ছাদ পাকা নয়, টিনের এক ছাউনি মাত্র, ঘরে খাট পালঙ্ক নেই, চাটায়ের উপর শুয়ে আছে। অথচ এক হাত নিজের মাথার নিচে রাখল আর তখনই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল এবং একটানা আট ঘন্টা তৃপ্তি সহকারে ঘুমিয়ে সকালে জাগ্রত হল। বল এখন, শান্তি কে পেল? এ লোক না ঐ লোক? ঐ ব্যক্তির কাছে আরামের আসবাবপত্র সবই ছিল ঠিক অথচ শান্তি পেল না, পক্ষান্তরে এই খেটে খাওয়া দিনমুজুরের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির বাহ্যিক আসবাবপত্র কিছুই ছিল না অথচ সে ঠিকই শান্তি পেল, আরামের ঘুম ঘুমাল। স্মরণ রেখো! যদি জাগতিক অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের পেছনে লেগে যাও এবং অন্যের তুলনায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের ধান্দায় পড়ে যাও তবে ভাল করে বুঝে নাও যে, আরামের জিনিসপত্র তো পুঞ্জিভূত হয়ে যাবে ঠিক কিন্তু আদৌ অন্তরে প্রশান্তি আসবে না।

সেই অর্থ সম্পদ কোন কাজের!

আমার আব্বাজানের জীবদ্দশায় এক ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি বিশাল কারখানার মালিক ছিলেন। তার ব্যবসা-বাণিজ্য শুধুমাত্র পাকিস্তানেই সীমীত ছিল না বরং বিভিন্ন রাষ্ট্রেও তার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। একদিন আমার পিতা স্বাভাবিকভাবেই তাকে প্রশ্ন করলেন– আপনার ছেলেমেয়ে কত জন? তিনি জবাব দিলেন–এক ছেলে সিঙ্গাপুর আছে। এক

ছেলে অমুক রাষ্ট্রে আছে। সবাই ভিন্নদেশে বিভুঁই। পুনরায় আমার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার ছেলেপেলেদের সাথে কি আপনার দেখা সাক্ষাত হয়? তিনি বললেন– এক ছেলের সাথে দেখা হয়েছে পনের বছর হয়। পনের বছর যাবৎ পিতা পুত্রের চেহারা দেখে না, পুত্র পিতার মুখ দেখে না। তাহলে এখন বলুন– এমন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ কী কাজের যা সন্তানদের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে, পিতার চেহারা পর্যন্ত দেখাতে পারে না। পিতাকে পুত্রের চেহারা সুরত পর্যন্ত দেখাতে পারে না। আরামের জিনিসপত্র ও শান্তির উপায়-উপকরণ সঞ্চয়ের জন্য কত দৌড়-ধাপ হচ্ছে অথচ শান্তি নেই। কাজেই স্মরণ রেখো, সুখ-শান্তি কখনও টাকা-পয়সার বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না।

টাকা পয়সায় সব কিছু কেনা যায় না

কিছু দিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি বলছিলেন– আমি রমযানে ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তিও ওমরা করতে যাবেন। আমি বললাম– ওমরায় যাবেন, পূর্বে কিছু ব্যবস্থা করে নেওয়া প্রয়োজন। যেন পানাহরের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়ে যায়। সে অর্থ-অভিজাতের অহমিকায় ডুবে ছিল। বলতে লাগল– আরে মিয়া! রাখ তোমার ব্যবস্থা ইত্যাদি। আল্লাহর শুকরিয়া। প্রচুর পয়সা আছে। টাকা পয়সা হলে দুনিয়ার সব জিনিসই পাওয়া যায়, কোনও চিন্তা নেই। আমার কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা আছে। দশ রিয়ালের স্থলে বিশ রিয়াল খরচ করব। পরে তিনিই বলেন– আমি দু' দিন পর তাকে দেখলাম, হারাম শীফের দরজায় মাথা নিচু করে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম– ভাই! কি খবর? সে বলতে লাগল– সাহরীর সময় ঘুম থেকে উঠেছি অথচ হোটেলে খানা পেলাম না, খানা ফুরিয়ে গেছে। মাথায় অহংকার ছিল, টাকা পয়সায় সব জিনিসই কেনা যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখিয়ে দিলেন, দেখ! টাকা তোমার পকেটেই রয়ে গেল অথচ সাহরী খাওয়া ছাড়াই রোযা রাখতে হল।

শান্তির পথ

এই টাকা-পয়সা, তৈজসপত্র, ধন-সম্পদ যত কিছু তোমরা সঞ্চয় করছ প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ক্রিয়ভাবে এসব আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে না। টাকা-পয়সা দিয়ে সুখ-শান্তি কেনা যায় না। তা শুধুমাত্র আল্লাহর

দান, অনুগ্রহের নেয়ামত। যাবৎ না আত্মতৃপ্তি আসবে, যাবৎ না এই অনুভূতি যাগবে যে, আল্লাহ প্ররাক্রম বৈধভাবে এবং হালাল পথে আমাকে যতটুকু দিচ্ছেন তাতেই আমার প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে; ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্থিরতা ও শান্তি আসবে না। কত লোক এমন আছে যাদের কাছে অর্থ-সম্পদের কোনও কমতি নেই কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাদের স্থিরতা নেই, মনে প্রশান্তি নেই। রাতে ঘুম আসে না। ক্ষুধায় কষ্টপায়। এ সব দুনিয়ার মোহ-মায়ায় দৌড়-ঝাপের পরিণতি।

কাজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশার্দ করেন– পার্থিব বিষয়ে নিজের তুলনায় উপরস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। হিসেব কষো না, সে কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে? বরং নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি খেয়াল কর –তার বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও কত কি বেশি দিয়ে রেখেছেন! এতে তোমার ভেতর প্রশান্তি ও স্থিরতা আসবে। পক্ষান্তরে দ্বীনী ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরস্থদের প্রতি লক্ষ্য কর। এতে করে নেক কাজে অগ্রসর হওয়া এবং উন্নতি লাভ করার আগ্রহ ও জয্বা জাগবে। অগ্রগামী হওয়ার যে আগ্রহ ও স্পন্দন জাগবে সে স্পন্দন হবে বড় স্বাদের।

দুনিয়া সঞ্চয়ের অস্থিরতা বড় কষ্টদায়ক, বড় বিষাদময়। এ অস্থিরতা রাতের ঘুম দূর করে দেয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করে দেয়। কিন্তু দ্বীনের জন্য যে ব্যাকুলতা, আকুলতা তা বড়-ই মজাদার, নিতান্তই স্বাদের। মানুষ যদি জীবনভর এই ব্যাকুলতায় ডুবে থাকে তবুও এ স্বাদ সামান্য পরিমাণ হ্রাস পাবে না। আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিতে থাকবে। কিন্তু আমাদের গোটা জীবনের স্রোত উল্টো দিকেই বহমান। আল্লাহ তা'আলা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। আমদের অন্তর-আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। যে পথ আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে দেখিয়েছেন, সে পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কঠিন পরিক্ষা সন্নিকটেই

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا . ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا –

উপরিউক্ত হাদীসখানা হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– দ্রুত সাওয়াবের কাজ করে নাও। যতটুকু সময় পাচ্ছ, তা গণীমত মনে কর। কারণ কঠিন পরীক্ষা আসন্ন, এমন পরীক্ষা যেন আঁধার রাতের একাংশ। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন অন্ধকার রাত শুরু হয় এবং তার একাংশ অতিবাহিত হয়ে যায় তখন এর পরবর্তি দ্বিতীয়াংশও রাতেরই অংশ হয়ে থাকে। সে সময় অন্ধকার আরও বাড়তে থাকে। এরপর তৃতীয়াংশে অন্ধকার আরও বেড়ে যায়। সুতরাং মানুষ যদি ভাবতে থাকে, এখনও মাগরিবের সময়, হালকা মাত্র অন্ধকার, কিছুক্ষণ পরে ফর্সা হয়ে যাবে তখন নেক কাজ করব, তাহলে সে আহমক ছাড়া কিছু নয়। কেননা যে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, এরপর আরও বেশি অন্ধকার আসছে। কাজেই দুজাহানের বাদশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– যদি তোমরা মনে মনে অপেক্ষায় থাক, আরও কিছু সময় বয়ে যাক, তখন নেক কাজ আরম্ভ করা যাবে তাহলে স্মরণ রেখো, সামনে যে সময় আসছে তা আরও ঘোর আঁধারচ্ছন্ন। সামনে যে পরীক্ষা ও বিপর্যয় আসছে তা আঁধার রাতের একাংশ। কেননা পত্যেক ফেতনা ও পরীক্ষার পর আরও বড় ফেৎনা ও পরীক্ষা অপেক্ষামান। এরপর নবীজী বলেন– সকালে মানুষ মুমিন থাকবে আর সন্ধায় কাফির-বেদ্বীন হয়ে যাবে আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে আর সকালে কাফির হয়ে যাবে।

অর্থাৎ দুনিয়ার যথসামান্য ও নগন্য জিনিসের বিনিময়ে সে নিজের দ্বীন-ধর্মকে বিকিয়ে দিবে। সকালে মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিল, এরপর যখন জীবনের কাজ কারবারে গেছে তখন দুনিয়া কামানোর ধান্দায় পড়ে গেছে, অর্থ সম্পদের মোহে ডুবে গেছে। আর ইতোমধ্যে সম্পদ উপার্জনের এমন পথ খুলে গেছে, যার সাথে শর্তই ছিল, তুমি দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দাও তবে এই অর্থ-সম্পদ পেয়ে যাবে। এবার মনে ইতঃস্ততা শুরু হয়ে গেল, দ্বীন -ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এ সম্পদ হাতিয়ে নেব না কি এ তুচ্ছ অর্থ-সম্পদে লাথি মেরে দ্বীন-ঈমানই গ্রহণ করব?

কিন্তু যেহেতু এ লোক পূর্ব থেকেই টালবাহানা ও ভাল কাজ মূলতবী করে অভ্যস্ত সেহেতু সে ভাবল, দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ কবে হবে স্পষ্ট জানা নেই। কবে মরব? কবে হাশর হবে? কবে আমাদের হিসাব নিকাশ হবে? সবই তো অনেক পরের কথা। নগদ এ অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে

নেওয়াই এখন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এবার সে দুনিয়ার বিষয়-সম্পত্তির জন্য নিজের দ্বীন-ধর্মকে বিকিয়ে দেবে। কাজেই নবীজী ইরশাদ করেন– সকালে সে মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছিল আর সন্ধ্যায় কাফির অবস্থায় শুইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

"এখনও তো যুবক" -এক প্রবঞ্চনা

সুতরাং কিসের প্রতিক্ষায় রয়েছ? যদি ভাল কাজ ও নেক আমল করতে চাও এবং খাটি মুসলমানের মত বাঁচতে চাও তবে অপেক্ষা কিসের? যে আমল করার তা এখনই দ্রুত করে ফেল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথার উপর আমল করছি কি না প্রত্যেকেই এখন সে হিসাব কষে দেখি। আমাদের মনে নেক আমল করার আগ্রহ ও জয্বা জাগে প্রায়ই কিন্তু শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে– সামনে এখনও তো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, এখনও তো যুবক, সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি, অর্ধজীবনে পৌছেছি, এরপর বৃদ্ধ হব, তখন ভালমত নেক আমল শুরু করে দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি হাকীম, আমাদের রগ-রেষা সম্পর্কেও ছিলেন ওয়াকিফহাল। তিনি জানতেন, শয়তান মানুষকে এভাবেই প্রতারিত করবে। তাই তিনি ইরশাদ করেন– নেক আমল দ্রুত করে ফেল। যে সব নেক কাজের কথা জেনেছ, তার উপর আমল করতে লেগে যাও। আগামী দিনের অপেক্ষা কর না। কেননা আগামী দিনে আসন্ন ফেৎনা, পরীক্ষা ও বিপর্যয় তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে তা আদৌ জানা নাই। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

নফ্সকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ উদ্ধার কর

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব (আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) বলতেন– নফ্সকে একটু ধোঁকা দিয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ উদ্ধার কর। তিনি নিজের একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন– আমার নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। শেষ বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্যের সময় একদিন (আল্হামদু লিল্লাহ) তাহাজ্জুদের সময় যখন দু' চোখ খুলে গেল। অবশ্য তখন শরীরে বেশ ক্লান্তি ও অলসতা লেগে ছিল। ভাবলাম, আজ তো স্বাস্থ্য মন তেমন ভাল নয়। ক্লান্তিও রয়েছে। বয়সও হয়েছে অনেক। তাছাড়া তাহাজ্জুদ নামায কোনও ফরয-ওয়াজিব নামাযও নয়, থাক পড়ে। আজ তাহাজ্জুদ ছেড়ে

দিলেই বা তেমন আর কি ক্ষতি হবে? কিন্তু আমি বললাম– কথা সত্য, তাহাজ্জুদ ফরয-ওয়াজিব কিছুই নয়, এদিকে স্বাস্থ্য-মনও তেমন ভাল নয় কিন্তু এ সময় তো আল্লাহর দরবারে কবুলিয়্যাত ও গৃহীত হওয়ার সময়।

হাদীস শরীফে আছে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ কেটে যায় তখন আল্লাহর বিশেষ রহমত জগদ্বাসীর উপর বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে এক আহবানকারী ডাকতে থাকে, ক্ষমাপ্রার্থী কেউ আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা আদৌ উচিৎ নয়। নফ্‌সকে ভুলিয়ে দিলাম যে, ওঠে বসে যাও এবং বসে বসেই একটু দু'আ করে নাও; এরপর শুয়ে যেও। সুতরাং ওঠে বসে পড়লাম এবং দু'আ আরম্ভ করলাম। দু'আ করতে করতে নফ্‌সকে বললাম– মিয়া! ওঠে যখন বসে পড়লে, তোমার তন্দ্রা তো কেটেই গেছে, এখন গোসলখানা পর্যন্ত চলে যাও এবং ইসতিন্‌জা ইত্যাদি সেরে নাও। এরপর এসে আরামে ঘুমিও। যখন গোসল খানায় পৌছে ইসতিনজা ইত্যাদি সেরে নিলাম তখন বললাম, চলো, অযুও করে নাও। কেননা অযু করে দু'আ করার মাঝে গ্রহণ যোগ্যতা আরও বেশি। সুতরাং অযুও করে নিলাম এবং বিছানায় এসে বসে দু'আ শুরু করলাম। অতঃপর নফ্‌সকে বুঝালাম, বিছানায় বসে বসে কি আর দু'আ হয়, তোমার দু'আ করার নির্ধারিত স্থানে গিয়েই দু'আ করে এসো। অতঃপর নফ্‌সকে জায়নামায পর্যন্ত টেনে নিলাম। যেয়েই দ্রুত দু' রাকা'আত তাহাজ্জুদের নিয়্যত বেঁধে ফেললাম। এরপর হযরতজী বললেন– এ নফসকে একটু একটু ধোঁকা দিয়ে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হয়। এ নফস যেভাবে তোমাদের নেক কাজ বিলম্বিত করিয়ে থাকে তদ্রূপ তার সাথে এমনই আচরণ কর। তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাও। ইনশা আল্লাহ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা ঐ নেক কাজের তাওফীক দিয়ে দিবেন।

হঠাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের বার্তা এলে!

একবার হযরতজী বলেন– ফজরের নামাযের পর আমি নিয়মিত কিছু আমল করতাম, যিকির আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল পড়ে প্রপয় দুই ঘন্টা কাটাতাম। হঠাৎ একদিন স্বাস্থ্য-মনে কিছুটা আলসে ভাব এসে গেল। আমি মনকে বুঝালাম, আজ তো বলছ, স্বাস্থ্য-মন তেমন ভাল নেই, ওঠতে-বসতে পারছি না। আচ্ছা ভাল কথা! কিন্তু বলতো এ মুহূর্তে যদি কোনও রাষ্ট্রদূত সরকারী ফরমান নিয়ে এসে বলে– 'তোমাকে অমুক

পুরষ্কার গ্রহণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে' তাহলে তোমার এই অলসতা বহাল থাকবে কি? নফ্স জবাব দিল– না, তখন আর অলসতা কিংবা কোনও পিছুটান টিকে থাকবে না বরং দৌড়ে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণের চেষ্টা করব। অতঃপর নিজের নফ্সের উদ্দেশ্যে বললাম– এ সময়ও মহামহীম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়। এ উপস্থিতির বরকতে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত নেয়ামত লাভের উপযুক্ত সময়। এরপরও আলস্য ও ইতঃস্ততা কিসের? ছেড়ে দাও ওসব! ব্যাস, এই চিন্তা করে নিজের মনকে ঘুরিয়ে নিয়মিত আমলসমূহে লিপ্ত হয়ে গেলাম এবং ওযীফাসমূহ পড়তে লাগলাম। সারকথা হল, এ নফ্স ও শয়তান তো মানুষকে প্ররোচিত করার কাজে ব্যস্ত। তাই তোমরাও তাদেরকে প্রতারিত করে জয্বার সাথে বেশি বেশি নেক কাজ করে যাও।

প্রকৃতই যে জান্নাত চায়

তৃতীয় হাদীস হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– উহুদ যুদ্ধের সময় যখন রণক্ষেত্র ভারি উত্তপ্ত। মুজাহিদ মুসলমানদের সংখ্যা কম, কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা প্রচুর। মুসলমানদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও অস্ত্র-সস্ত্র নেই। কাফিররা ভারী রণাসম্ভারে সুসজ্জিত। সার্বিক দিক দিয়ে রণক্ষেত্র মুসলমানদের প্রতিকূল। এমনি এক সময় গ্রাম্য বেদুঈনের মত জনৈক ব্যক্তি খেজুর খেতে খেতে যাচ্ছিলেন। তিনি এসে নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! যে যুদ্ধ আপনারা করেছেন, আমি যদি এ যুদ্ধে নিহত হই তবে আমার পরিণতি কি হবে? নবীজী বললেন– এর বিনিময় জান্নাত। তুমি সোজা জান্নাতে চলে যাবে। হযরত জাবের (রাযি.) বলেন– আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি খেজুর খেতে খেতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন, এ জিহাদে শরীব হওয়ার পতিদান জান্নাত, তখন তিনি খেজুর ছুড়ে ফেলে সোজা রণাঙ্গনে ঢুকে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এখানেই শাহাদতের অমীয় সুধা পান করল। কারণ, যখন তিনি শুনলেন, এ জিহাদে শরীব হওয়ার পতিদান জান্নাত, তখন তিনি এতটুকু কাল বিলম্ব পছন্দ করেন নি যে, ঐ খেজুরগুলো খেয়ে তারপর জিহাদে শলীক হবে। বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছেও দিলেন। নেক কাজের যে আগ্রহ ও জয্বা তার মনে জাগ্রত হয়েছিল, কালবিলম্ব না করে তৎক্ষনাত সে আমল করে নেওয়ার বদৌলতেই তার এ বিনিময় লাভ হয়েছে।

আযানের ধ্বনী শুনে নবীজীর অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাযি.) কে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন– উম্মুল মুমিনীন! দুজাহানের বাদশাহ নবীজী ঘরের বাইরে যেসব কথাবার্তা বলতেন এবং যেমন জীবন কাটাতেন আমরা তো সবই জানি কিন্তু ঘরের ভেতর তিনি কি কি আমল করতেন, কেমন জীবন কাটাতেন –সে কথা খানিক বলুন? (সম্ভবত প্রশ্নকারীর ধারণা ছিল, নবীজী ঘরে যেয়ে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ে এবং যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল করে সময় কাটাতেন) হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন– নবীজী যখন ঘরে তাশরীফ রাখেন তখন আমাদের সাথে ঘরের কাজকর্মও করে থাকেন। আমাদের দুঃখ ব্যথাও শুনে থাকেন। আমাদের সাথে হাস্য-রসও করেন এবং মিলেমিশে থাকেন। তবে যখন আযানের মধুর ধ্বনী তার কর্ণকুহরে পৌঁছে তখন এমনভাবে ওঠে চলে যান, যেন তিনি আমাদের চেনেনই না।

চতুর্থ এ হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিতঃ

جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! أى الصدقة اعظم اجرا ؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم - قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان - متفق عليه

উত্তম সদকা

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– সব চেয়ে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় কোন সদকায়? তিনি বললেন– উত্তম সদকা হচ্ছে, তুমি সুস্থ অবস্থায় যে সদকা কর এবং এমন পরিস্থিতিতে সদকা কর, যখন তোমার অর্থ-সম্পদের মোহ থাকে এবং অন্তরে খেয়াল হয়, এ অর্থ-সম্পদ এমন জিনিস নয় যে, এমনিতেই উড়িয়ে দেওয়া হবে। অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে কষ্টও লাগে। কেননা তার আশঙ্কা হচ্ছে, এ দান-সদকার পরিণামে না জানি, দারিদ্রতার শিকার হতে হয়! তাছাড়া পরবর্তীতে কি অবস্থা হবে তা-ও জানা নাই। তখন যে দান-সদকা করবে তার বিনিময় বহুগুণ হবে। অতঃপর তিনি বলেন– দান-সদকা করার আগ্রহ জাগলে তা মূলতবী কর না।

এ হাদীসে বুঝা যায়, কিছু লোক দান-সদকা করা নিয়ে টালবাহানা করে আর মনে করে মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন কিছু অসিয়্যত করে যাব, মৃত্যুর পর আমার পক্ষ থেকে এ পরিমাণ সম্পদ

অমুককে দেবে, এ পরিমাণ তমুককে দিবে। আর এ পরিমাণ কাজে খাটাবে ইত্যাদি। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা তো এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অমুককে দিয়ে দেওয়ার কথা বলছ, আরে ভাই! মৃতুরপর তো এ সব ধন-সম্পদ তোমারই রইল না, অন্য কারও হয়ে গেলে।

কেননা শরী'আতের বিধান হল, কেউ যদি অসুস্থ অবস্থায় কিছু দান-সদকা করে কিংবা দান-সদকা করার অসিয়্যত করে বলে, এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অমুককে যেন দেওয়া হয় কিংবা হেবা করা হয় আর ঐ রোগেই তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র তার পুরো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে দান-সদকা কার্যকর করা হবে আর অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ওয়ারেসগণ পাবেন। কেননা তা ওয়ারেসদেরই প্রাপ্য। মৃত্যুর পূর্বেই তার অসুস্থ অবস্থায় ঐ সম্পত্তির সাথে ওয়ারেসদের অধিকার সমপৃক্ত হয়ে গেছে। ভেবেছিল, শেষ জীবনে গিয়ে কোনও সদকায়ে জারিয়া রেখে যাব তাহলে স্থায়ীভাবে সাওয়াব পেতে থাকব। অথচ তা ছিল অপারগ অবস্থার দান-সদকা। আর অধিক পরিমাণে সাওয়াব ও পুরস্কার হাসিলের সদকা তো ছিল, সুস্থাবস্থায় অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন, লোভ-লালসা এবং পঞ্জিভূত করার মোহ থাকা সত্ত্বেও যে দান-সদকা করা হত।

সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে অসিয়্যত কার্যকর হবে

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর পরও সাওয়াব পাওয়ার আশায় কোনও সদকায়ে জারিয়া রেখে যাওয়া কিংবা অসিয়্যত করে যাওয়ার নেক জয্‌বা অনেকেই রাখেন। যদি কেউ নিজের জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় অসিয়তনামায় লিখে যায়, আমার মৃত্যুর পর এ পরিমাণ ধন-সম্পদ অমুক দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে তবে এই অসিয়্যত শুধুমাত্র তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ থেকেই কার্যকর হবে। এর অধিক থেকে কার্যকর হবে না। কাজেই নবীজী ইরশাদ করেন– দান-সদকা করার জয্‌বা ও আগ্রহ জাগলে তৎক্ষণাত এর উপর আমল করে নাও এবং কিছু দান-সদকা করে ফেল।

আয়ের এক তৃতীয়াংশ সদকার জন্য পৃথক করে রাখ

এ ব্যাপারে একটা পদ্ধতি পূর্বও উল্লেখ করেছি। বুযুর্গ লোকেরা যার বাস্তব অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন। এর উপর যদি মানুষ আমল করে তাহলে দান-সদকা করার তাওফীক হয়ে যায়। নতুবা আমরা তো ভাল কাজ বিলম্বিত করেই অভ্যস্ত। নিয়ম হল, আপনার আয়ের একাংশ আল্লাহর

রাস্তায় খরচ করার জন্য নির্ধারণ করে নিন। আল্লাহ যতটুকু তাওফীক দেবেন চাই তা দশ কি বিশ ভাগের এক ভাগই হোক না কেন। অতঃপর আমদানী হলে, তার থেকে নির্ধারিত অংশ পৃথক করে রেখে দিন। এ জন্য যদি কোনও থলে বানিয়ে তাতে রেখে দেওয়া যায় তবে স্বয়ং ঐ থলেই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, আমাকে ব্যয় কর। কোনও ভাল কাজে ব্যবহার কর। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা খরচ করার তাওফীক দিয়ে দিবেন। কেননা খরচ করার সুযোগ এলেও মানুষ ইতঃস্ততা বোধ করে, খরচ করব কি করব না? কিন্তু যখন ঐ থলে থাকবে, পূর্ব থেকে তাতে পয়সা রাখা থাকবে, স্বয়ং ঐ থলেই দান-সদকা করার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। সময় সুযোগ এলে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন পড়বে না। যদি প্রত্যেক মানুষই নিজের সামর্থ অনুযায়ী এ নিয়ম বানিয়ে নেয় তবে তার জন্য দ্বীনের পথে খরচ করা সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সংখ্যার হিসেব হয় না

স্মরণ রেখো! আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনও সংখ্যা ও পরিমাণ হিসেব হয় না বরং জয্‌বা ও ইখলাসের হিসেব হয়। এক ব্যক্তি যার আয় শ' টাকা মাত্র। যদি সে এক টাকাও আল্লাহর পথে খরচ করে তবে তার এ দান ঐ ব্যক্তির সমান যার আয় লাখ টাকা আর সে দান করে হাজার টাকা। উপরন্তু এক টাকা সদকাকারী নিজের ইখলাসের বদৌলতে ঐ লক্ষ্য টাকা দানকারী অপেক্ষাও অগ্রসর হয়ে যায় কি না তা-ও জানা নেই। এজন্য পরিমাণ দেখো না বরং দেখ, কিভাবে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করার ফযীলত লাভ করা যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। আয়ের কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে আল্লাহর পথে খরচ করতে থাক।

আমার আব্বাজানের নিয়ম

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) সব সময় অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ এবং বিনা পরিশ্রমে অর্জিত আমাদানীর দশ ভাগের এক ভাগ পৃথক থলিতে ভরে রাখতেন। এটা তাঁর গোটা জীবনের নিয়ম ছিল। যদি একটি টাকাও কোথা হতে আসত তবে তাৎক্ষণাত দশ ভাগের এক ভাগ বের করে, রেজগি করে ঐ থলিতে ফেলে রাখতেন। সাময়িকভাবে যদি

কখনও এ নিয়মের উপর চলা একটু কষ্টকরও হত কিংবা কখনও কখনও কাঁচা পয়সা পাওয়া না যেত, তখন কি করবেন? এ জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন। কিন্তু সারাজীবনে কখনও এর বিপরীত দেখি নি এবং কখনও থলি শূন্য হতে দেখি নি। এভাবে মানুষ যখন আয়ের একাংশ বের করে পৃথক স্থানে রাখে, তখন স্বয়ং ঐ থলিই স্মরণ দ্বীনের পথে দান-সদকা এবং ভাল জাগায় ব্যবহার করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর বরকতে দ্বআল্লাহ তা'আলাও দ্বীনের পথে খরচ করার তাওফীক দিয়ে দেন।

প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত সদকা করবে

এক ভদ্রলোক একবার বলছিলেন– ভাই সাহেব! আমার কাছে তো কিছুই নেই, খরচ করব কোত্থেকে? আমি বললাম– এক টাকা কি আছে এবং তা থেকে এক পাই পয়সা বের করতে পারবে তো? ফকীর থেকে ফকীর ব্যক্তির কাছেও এক টাকা অবশ্যই থাকে। আর এক টাকা থেকে এক পাই পয়সা বের করলে কি বড় কোনও ক্ষতি হবে? ব্যাস, এক পয়সা বের দাও। তখন যদি ঐ ব্যক্তি এক পয়সা বের করে দেয় তা অপর এক লক্ষ্যপতির হাজার টাকা বের করার মাঝে কোনও তফাৎ নেই। কাজেই পরিমাণ দেখ না বরং যখন যে আগ্রহ ও জয্বা সৃষ্টি হবে তার উপর আমল করে নাও।

এটাই নিজেকে শুধরানোর উত্তম ব্যবস্থাপত্র। ব্যাস, নিজে নিজেকে অধঃপতন থেকে রক্ষা কর। যদি মানুষ এ আমল করে তবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে সঠিক পথে মাল ব্যয় করার বড় সুযোগ তার হয়ে যায় এবং ঐ ফযীলতও হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ নেক কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

কার প্রতিক্ষায় আছ?

عن أبی هريرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا ، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ، أو غنی مطغيا ، أو مرضا مفسدا ، أوهرما مفنّدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهی وأمر أوكما قال صلی الله عليه وسلم –

এ রিওয়ায়েত হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। এখানে ভাল কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার চিন্তা-ফিকির করার ব্যাপারে আলোচনা

করা হয়েছে। যা হোক তিনি বলেন- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- بادروا بالاعمال سبعا সাতটি জিনিস আসার পূর্বে দ্রুত থেকে দ্রুত ভাল কাজ করে নাও। যার পর ভাল কাজ করার সুযোগ মিলবে না। অতঃপর ঐ সাতটি জিনিসকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেন।

কী, দৈন্যতার প্রতিক্ষায় রয়েছে?

فقرا منسيا অর্থাৎ তোমরা নেক আমল বা ভাল কাজ করার জন্য এমন দারিদ্রতা ও দৈন্যতার অপেক্ষা করছ, যা মানুষকে আত্মবিস্তৃত করে দেবে? মর্মকথা হল, এ মুহূর্তে তোমরা তো বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় আছ, টাকা-পয়সা হাতে আছে, খাদ্য-পানির অভাব নেই এবং আরাম আয়েশেই কালাতিপাত করছ। এমতাবস্থায় যদি তোমরা নেক আমল ও ভাল কাজ না কর বরং বিলম্বিত কর তবে কি তোমরা এ অপেক্ষা করছ, যখন তোমাদের স্বচ্ছলতা থাকবে না, আল্লাহ না করুক দারিদ্রতা ও দৈন্যতা ঘিরে ধরবে আর ঐ দারিদ্রতা ও দৈন্যতার কারণে তোমরা স্বাভাবিক বিষয়সমূহও ভুলে যাবে, তখন কি নেক আমল করবে? যদি তোমাদের ধারণা এমনই হয় যে, এ স্বচ্ছলতার সময় তো আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদ আর বিলাসিতার সময়। পরে এক সময় নেক আমলে লেগে যাব। তাহলে তোমরা বড় বিভ্রান্তির মাঝে ডুবে আছ। এরই জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করছেন- যখন আর্থিক সংকট প্রকট হয়ে দাঁড়াবে তখন নেক আমল থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে সময় মানুষ এত বেশি দুঃশ্চিন্তায় থাকে যে, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ-কারবারও ভুলে বসে। অর্থনৈতিক পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা আসার এবং জীবন সংকটের মুখোমুখী হওয়ার পূর্বে তোমাদের এখন যতটুকু স্বচ্ছলতা আছে, তা-ই গণীমত মনে করে কাজে লাগাও এবং নেক আমলের মাঝে ব্যয় কর।

কী, ধনাঢ্যতার অপেক্ষায় আছ?

أو غنى مطغيا অথবা তুমি কি এমন অর্থ-আভিজাত্যের অপেক্ষা করছ, যা মানুষকে দাম্ভী-অহংকারী বানিয়ে দেয়? অর্থাৎ বর্তমানে যদিও খুব বেশি ধনবান হও নি তাই ধারণা করছ, এখনও কিছুটা আর্থিক সংকট রয়েছে কিংবা আর্থিক সংকট তো নেই তবু মন চায় আরও প্রচুর টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাই তখন নেক আমল করব।

স্মরণ রেখো! যদি অর্থ-আভিজাত্যের প্রাচুর্য হয়ে যায়, টাকা-পয়সা অধিক পরিমাণ হস্তগত হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদের স্তুপ জমে যায় তাহলে আশঙ্কা আছে, কখনও আবার এমন না হয় যে, ঐ ধন-সম্পদ তোমাকে আরও বেশি দাম্ভীক-অহংকারী বানিয়ে দেয়। কারণ, হাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকলে এবং আরাম-আয়েশ বেড়ে গেলে মানুষ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেই ভুলে বসে। অতএব যখন যে নেক আমলের জয্বা ও আগ্রহ জাগে তৎক্ষনাত তা করে নাও। কাল বিলম্ব কর না।

কী, রুগ্নতার অপেক্ষা করছ?

أو مرضا مفسدا অথবা এমন অসুস্থতার অপেক্ষা করছ, যা তোমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেব? অর্থাৎ এখন তো স্বাস্থ্য-মন ভাল। দেহে শক্তি ও বল আছে। এখন যদি কোনও আলম করতে চাও তবে সহজেই করতে পারবে। তারপরও কি নেক আমল এ উদ্দেশ্যে বিলম্বিত করছ যে, এ সুস্থতা দূর হয়ে যাক আর আল্লাহ না করুক রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করুক। তারপর নেক আমল করবে? আরে ভাই! সুস্থ অবস্থায় যখন তুমি নেক আমল করতে পার না তখন অসুস্থ অবস্থায় কি নেক আমল করতে পারবে? উপরন্তু আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, কখন কি রোগ আক্রমণ করে। কাজেই তেমন কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

কী, বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ?

أو هرما مفنّدا অথবা তোমরা কি জ্ঞান শূন্য করা ও বোকা বানানোর মত বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ? ভাবছ, এখনও তো আমরা যুবক? আমাদের বয়সই আর কত হয়েছে? দুনিয়ার দেখেছি-ই বা কি? যৌবনের এ সময়টা আরাম-আয়েশ আর আমোদ-প্রমোদেই কাটতে দাও। পরেও নেক আমল করা যাবে। তাই দুজাহানের বাদশা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমরা কি বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ? অথচ কখনও কখনও বার্ধক্যে মানুষের অনুভূতি জ্ঞানও হ্রাস পায়। যদি কোনও কাজ করতেও চায় তবুও করতে পারে না। অতএব এমন বৃদ্ধকাল আসার পূর্বে এ যুবক বয়সেই নেক আমল করে নাও। বুড়োকালে তো অবস্থা এমন হয় যে, না মুখে থাকে দাঁত, না পেটে থাকে আতুড়ি। আর তখন তো গুনাহ করার শক্তিই থাকে না। সে সময় যদি কেউ গুনাহ থেকে বেঁচেও যায় তবে কি আর বিরাট কিছু করল সে ? যখন ভরপুর যৌবন, দেহে বল-শক্তি প্রচুর আছে, গুনাহ করার উপায় উপকরণও উপস্থিত, গুনাহ করার আগ্রহও মনে

আছে, ঐ সময় যদি মানুষ গুনাহ থেকে চেঁচে যায় তাহলে প্রকৃতপক্ষেই এ হবে নবী-রাসূলগণের তরীকা। এ ব্যাপারে শাইখ সা'দী বলেন–

که وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار
در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است ۔

আরে ভাই! বৃদ্ধকালে তো জালেম বুড়োও পরহেযগার হয়ে যায়। সে এ জন্য পরহেযগার হয় নি যে, তাকে কোনও চারিত্রিক দর্শন পরহেযগার বানিয়ে দিয়েছে কিংবা তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় এসে গেছে বরং তার পরহেযগার হওয়ার কারণ হচ্ছে, এখন তো সে কিছু করতেই পারে না। কাউকে চিরে ফেঁড়ে খেতে পারে না। সে শক্তি-বল-ই এখন আর নেই। কাজেই সে এক নির্জন নিভৃত কোণে পরহেযগার হয়ে বসে গেছে। পক্ষান্তরে ভরপুর যৌবনের সময় তাওবা করা আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের আদর্শ। এটাই হচ্ছে পয়গাম্বরদের স্বভাব বৈশিষ্ট। হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখ, তাঁর ভরপুর যৌবন, বল-শক্তি আছে, অবস্থাও স্বচ্ছল। গুনাহের আহ্বান করা হচেছ কঠিনভাবে। কিন্তু তাঁর যবানে উচ্চারিত হচ্ছে–

معاذالله إنه ربى أحسن مثواى

আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাই। এ হচ্ছে পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালামের আদর্শ। মানুষ যৌবনকালে তাওবাকারী হয়ে যাবে। যৌবনকালে মানুষ নেক আমল করবে। কিন্তু হাত-পা চালানোর শক্তিই যখন নাই তখন গুনাহ কি করবে? গুনাহ করার সময়-সুযোগই তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদের ধারণা কি এমন যে, যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন নেক আমল করবে, নামায পড়তে শুরু করবে, আল্লাহকে ডাকবে। বয়স বেড়ে গেলে পূর্বের ফরয হজ্ব করতে যাবে? আল্লাহই ভাল জানেন! জীবানায়ূ কত দিনের? কতটা সুযোগ মিলবে? সময় কি আসছে না কি যাচ্ছে? বার্ধক্য এসে পড়লে, তখন নেক কাজের সময়-সুযোগ হবে কি না? অবস্থা অনুকূল হবে না কি প্রতিকুল হবে তাও জানা নেই। কাজেই এখনই নেক আমল করে যাও।

কী, মৃত্যুর অপেক্ষায় আছ?

أو موتا مجهزا অথবা তোমরা কি সেই মৃত্যুর প্রহর গুনছ, যা আকস্মিকভাবে এসে যাবে। এখন তো তোমরা নেক আমলকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছ। ভাবছ, আগামী দিন করে নেব, পরশু দিন করে নেব। আরও কিছু সময় বয়ে যাক তারপর নেক আমল শুরু করে দেব। মৃত্যু যে অকস্মাৎও আসতে পারে তা কি তোমাদের জানা আছে ? কিছু কিছু সময় তো মৃত্যু

পূর্ব সংকেত দেয়, আল্টিমেটাম দেয় কিন্তু কখনও কখনও আল্টিমেটাম দেওয়া ছাড়াই এসে যায়। বর্তমান বিশ্বে তো এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। কিছুই জানা নেই কখন মানুষের সাথে কি আচরণ হয়ে যায়! এভাবে আল্লাহ তা'আলা বার্তা পাঠিয়ে থাকেন।

মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাত

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তির একবার মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। (আল্লাহ জানেন এ কেমন ঘটনা, তবে বিরাট শিক্ষণীয়) তখন সে ব্যক্তি আযরাঈল (আ.) কে বলল– জনাব! আপনার কাজ-কারবার বড় বিস্ময়কর! যখন ইচ্ছে, ধমক দেন। প্রাণবায়ূ বের করে নেন। দুনিয়ার নিয়ম তো যদি কাউকে কোনও শাস্তি দিতে হয় তবে পূর্বেই তাকে সকর্ত করা হয়, অমুক সময় তোমার সাথে এমন আচরণ করা হবে, এ জন্য প্রস্তুত থাক। আপনি সতর্কীকরণ ছাড়াই এসে যান। আযরাঈল (আ.) জবাব দিলেন– আরে ভাই! 'দুনিয়াতে কোনও হুঁশিয়ারী দেই না' এতটুকু সতর্ক সংকেত তো আমি দেই! কিন্তু কেউ কোনও সতর্কবাণী শোনতেই পায় না এর কি ঔষধ রয়েছে ? তোমাদের যখন জ্বর আসে, রোগ-ব্যধি আক্রমণ করে, যখন সাদা চুল গজায়, মানুষের যখন নাতি নাতকর জন্ম নেয় সবই আমার সতর্ক সংকেত তা কি জান না? আমি তো একের পর এক হুঁশিয়ারী দিতে থাকি! তোমরা শোনতে পাও না এটা ভিন্ন কথা। এ সকল রোগ-ব্যাধিই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী, দেখ! তোমার সময় ঘনিয়ে আসছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

অর্থাৎ পরকালে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি তোমাদেরকে এ পরিমাণ জীবনায়ূ দেই নাই! যাতে কোন উপদেশ গ্রহণকারী ইচ্ছা করলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? আর তোমাদের কাছে ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছিল।

এ কোন্ সতর্ককারী এবং কোন্ ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছিল? এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনে কিরাম লেখেন– এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে মানুষদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে, এরপর তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে রাসূলুল্লাহ্ উপস্থিত হতে

হবে। কোনও কোনও মুফাস্‌সরীনে কিরাম লিখেন نذير অর্থ সাদা চুল। যখন মাথায় অথবা দাঁড়িতে সাদা চুল গজাবে তখন তা এক সতর্কবাণী। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী– এখন সময় ঘনিয়ে আসছে, প্রস্তুত হয়ে যাও। আবার কোনও কোনও মুফাস্‌সিরীনে কিরাম লিখেন نذير দ্বারা উদ্দেশ্য দৌহিত্র। যখন কারও দৌহিত্র জন্ম নিবে তখন বুঝবে তোমার সময় ঘনিয়ে আসছে, তৈরী হতে হবে। এ দৌহিত্রের জন্মই সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শনকারী। জনৈক কবি এরই ছন্দরূপ দিয়েছেন–

وبليت من كبر أجساد ها - إذا الر جال ولدت أولاد ها

تلك زروع قد دنا حصاد ها - وجعلت أسقامها تعتاد ها

.অর্থাৎ যখন মানুষের সন্তান জন্ম হয়ে যায় এবং বার্ধক্য জনিত কারণে তার শরীর পুরানো হয়ে যায়, একের পর এক রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করতে থাকে। কখনও এক রোগ আবার কখনও অন্য রোগ। এক রোগ ভাল হতে না হতেই অন্য রোগ আক্রমণ করে বসে। তখন বুঝবে, এটা ঐ ফসল যা কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সার কথা! সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। যদিও আল্লাহর নিয়ম তার পক্ষ থেকে একের পর এক হুঁশিয়ারী আসতেই থাকে কিন্তু কখনও কখনও আকস্মিকভাবে কোনও হুঁশিয়ারী ছাড়াই মৃত্যু এসে যায়। এ জন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমরা কি এমন মৃত্যুর অপেক্ষা করছ, যা সতর্ক সংকেত দেওয়া ছাড়াই অকস্মাৎ এসে পড়বে? কে জানে, জীবনায়ুর আর কতটা নিঃশ্বাস বাকি আছে? মৃত্যুর অপেক্ষা কেন করছ?

কী, দাজ্জালের অপেক্ষা করছ?

أو الدجـال অথবা তোমরা কি দাজ্জালের অপেক্ষা করছ? আর ভাবছ, এখন তো নেক আমল করার জন্য সময়-সুযোগ অনুকূলে বা উপযুক্ত নয়। তবে কি দাজ্জালের সময় ইবাদত আনুগত্যের অনুকূল ও উপযুক্ত হবে? যখন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে তখন ঐ বিপর্যয়ের সময় কি নেক আমল করতে পারবে? আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তখন যুগ-পৃথিবী কেমন হবে? ভ্রষ্টতার কত রূপরেখা এবং আহবানকারী জন্ম নেবে? তবুও কি তোমরা সে সময়ের অপেক্ষা করছ ?

فشرغايب ينتظر

অর্থাৎ দাজ্জাল বাহ্যতঃ অপেক্ষমান সকল জিনিসের মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম। তোমরা তার আগমনের পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

কী, কিয়ামতের অপেক্ষা করছ?

أَوِالسَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرّ

অথবা তোমরা কি কিয়ামতের অপেক্ষা করছ? তাহলে শুনে রাখ, কিয়ামত যখন আসবে তখন তা এত ভয়ঙ্কর বিপদের ব্যাপার হবে যে, এ বিপদের কোনও প্রতিরোধক ঔষধ-পথ্য মানুষের কাছে থাকবে না। অতএব কিয়ামত আসার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

পুরো হাদীসের সারসক্ষেপ হল, কোনও নেক আমল ও ভাল কাজ বিলম্বিত করো না। আজকের নেক কাজ আগামী দিনের জন্য রেখো না বরং যখনই নেক কাজের জযবা, আগ্রহ ও স্পৃহা জাগে তৎক্ষণাত তার উপর আমল করে ফেল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনাকে সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

হালাল উপার্জন ছাড়বে না

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوك عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد ـ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق فى شيئ فليلزمه من جعلت معيشة فى شيئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه ـ (كنزالعمال)

প্রিয় পাঠক!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– যার যে কাজের উসীলায় জীবিকা নির্বাহ হয় সে কাজে তার লেগে থাকা উচিৎ। অকারণে নিজের খেয়াল খুশি মত তা পরিত্যাগ করবে না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যার রুজি-রোজগার কোনও জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সে ঐ পেশা ছেড়ে অন্য পেশা অবলম্বন করতে যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিজে নিজে বদলে না যায় কিংবা এমনিতেই তার সাথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়ে না যায়।

জীবীকার কারণ "মিন জানবিল্লাহ"

যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন পথ খুলে দিলেন আর সে তাতে লেগে আছে, তার উসীলায় সে রিযিক পাচ্ছে তাহলে এখন অকারণে ঐ রুজি-রোজগার ছেড়ে দিবে না বরং তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। যাবৎ না স্বয়ং তা নিজে নিজে হাতছাড়া হয়ে যায় অথবা এমন প্রতিকূলতা সৃষ্টি না হয়, যদ্দরুন তা চালিয়ে যাওয়া দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানীর কারণ হয়। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলা কোনও উপায়ে চারটা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করে দিলেন তখন মনে রেখো, তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের দান। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাকে এ কাজে

লাগানো হয়েছে এবং এর সাথে তার জীবীকা সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কেননা স্বাভাবিকভাবে তো জীবিকা নির্বাহের বহু পথ ও উপায় রয়েছে কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা কারও জন্য জীবিকা নির্বাহের বিশেষ কোনও রাস্তা করে দিলেন তাহলে তা মিন জানিবিল্লাহ (আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের দান)। অতএব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রদত্ত পথকে অকারণে নিজের খেয়াল খুশি মত ছেড়ে দিবে না।

জীবিকা নির্বাহের খোদায়ী ব্যবস্থা ঃ

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ায় জীবিকা নির্বাহ ও জীবন যাপনের এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা বানিয়ে রেখেছেন, যা আমাদের বোধগম্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে।

– সূরা যুখরুফ-৩২

অর্থাৎ আমি পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি। আর তা এভাবে যে, কোনও মানুষের অন্তরে প্রয়োজন জাগ্রত করেছি আর অন্য মানুষের অন্তরে ঐ প্রয়োজন পূরণের পথ রেখে দিয়েছি। একটু চিন্তা করুন! মানুষের অভাব ও প্রয়োজন কত রকমের ? ভাত-কাপড়ের দরকার, বাড়িঘর, গৃহসামগ্রী ও হাড়ি-পাতিল দরকার, মানুষের জীবন যাপনের জন্য অসংখ্য আসবাবপত্রের দারকার। প্রশ্ন হল, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মিলে কখনও কি কনফারেন্স করেছে আর সে কনপারেন্সে মানুষের ভবিষ্যত প্রয়োজনাদির হিসাব করেছে? অতঃপর আপোষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এতজন লোক কাপড় বানাবে, এতজন লোক হাড়ি-পাতিল বানাবে, এতজন জোতা বানাবে, এতজন গম চাষ করবে; এতজন ধান-চাল উৎপাদন করবে। সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কনফারেন্স করে যদি এ ফায়সালা করতে চাইত তবুও মানব জীবনের সমূহ প্রয়োজন আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতঃপর তা আপোষে বন্টন করবে, তুমি এ কাজ করবে, তুমি অমুক জিনিসের দোকান দিবে। এ-তো আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা। তিনি কারও মনে গম উৎপাদন করার কথা গেঁথে দিয়েছেন। কারও মনে আটা পেষার মেশিন চালানো, কারও মনে ধান-চাউল উৎপাদনের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন। কারও মনে ঘী'র দোকান দেওয়ার আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এসব প্রয়োজনের

কথা জাগিয়ে দিয়েছেন যা তামাম মানুষের প্রয়োজন পড়ে থাকে। সুতরাং যখন আপনি কোনও প্রয়োজন পূরণ করতে চান, অভাব মোচন করতে চান এবং সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার কাছে টাকা-পয়সাও থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ বাজারে অবশ্যই আপনার ঐ প্রয়োজন মেটানোর মত আসবাবপত্র পাওয়া যাবে।

জীবিকা বন্টনের বিস্ময়কর ঘটনা

আমার বড় ভাই যাকী কাইফী সাহেব (আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) -এর সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন, তার সাহচর্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ছিলেন। একদিন তিনি বলেন– আল্লাহ তা'আলা কখনও কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন এমন নযীর দেখান যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিপালন, জীবিকাদানের পর মানুষ সিজদাবনত না হয়ে পারে না। লাহোরে ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত নামে তার একটি দ্বীনী পুস্তকালয় ছিল। তিনি সেখানে বসতেন। তিনি বলেন– একদিন সকালে আমি যখন বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। ভাবলাম, এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছে এখন তো গোটা জীবন ব্যবস্থাই পাল্টে গেছে, জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমি দোকানে গিয়ে কি করব? বই-পুস্তক কেনার জন্য কে দোকানে আসবে? কেননা এ অবস্থায় প্রথমে তো মানুষ ঘর থেকেই বের হতে পারে না। যদি বের হয়ও তবে কঠিন প্রয়োজনে কিংবা বিপদে পড়েই বের হয়। বই-পুস্তক বিশেষতঃ দ্বীনী বই-পুস্তক তো এমন জিনিস যার দ্বারা বাহ্যতঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে না। অন্য কোনও প্রয়োজনও পূরণ হয় না।

যখন মানুষের দুনিয়াবী সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তারপর বই-পুস্তকের খেয়াল আসে। কারণেই এ অবস্থায় কোন্ ক্রেতা বই-পুস্তক ক্রয় করতে আসবে আর আমি দোকানে গিয়ে কি করব? কিন্তু সাথে সাথেই খেয়াল হল, আমি তো রুজি-রোজগারের জন্য একটা পথ অবলম্বন করেছি, আল্লাহ তা'আলা এ পথকে আমার জন্য জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়েছেন। অতএব আমার কাজ হল, আমি গিয়ে দোকান খুলে বসে যাব, চাই কোনও ক্রেতা আসুক বা না আসুক। ব্যাস, আমি ছাতা হাতে দোকানে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে দোকান খুলে কুরআন তিলাওয়াতে লেগে গেলাম। ধারণা ছিল, ক্রেতা তো কেউ আসবেই না। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, মুষলধর বৃষ্টি ভেঙ্গে ছাতা হাতে লোকজন দোকানে আসছে আর কিতাবাদি ক্রয় করছে এবং এমন কিতাব ক্রয় করছে বাহ্যতঃ যা তাৎক্ষণিক

প্রয়োজন ছিল না। শেষ পর্যন্ত আজকেও অন্যান্য দিনের মত আমদানী হল। আমি শুকরিয়া নত হয়ে ভাবতে লাগলাম, হে আল্লাহ! যদি কোনও মানুষ চিন্তা করে তবে কারও বোধগম্য হবে না যে, এত অন্ধকার ঝড় তুফান প্রচন্ড বৃষ্টি বাদলের সময় দ্বীনী বই-পুস্তক কেনার জন্য কে আসবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে বই-পুস্তক কেনার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন আর আমার মনে দোকান খোলার আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন। আমার প্রয়োজন ছিল পয়সার আর তাদের প্রয়োজন ছিল কিতাবাদির। তাই উভয়কেই দোকানে একত্রিত করে দিলেন। তারা কিতাব পেয়ে গেল আর আমি পেয়ে গেলাম পয়সা। এ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হতে পারে। কেউ যদি মিছিল মিটিং করে, সমবায় সমিতি করে এ ব্যবস্থা করতে চায় তবে সারা জীবনে কখনও তা পারবে না।

রাতে ঘুমানো আর দিনে কাজ করা সহজাত স্বভাব

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) বলতেন– একটু চিন্তা করো! সমস্ত মানুষ রাতের বেলায় ঘুমায় আর দিনের বেলায় কাজকর্ম করে। রাতের বেলায় তন্দ্রা আসে আর দিনের বেলায় তন্দ্রাও আসে না। তাহলে কি সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কখনও কোনও আন্তর্জাতিক সেমিনার করেছে, যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে দিনের বেলায় কাজকর্ম করা আর রাতের বেলায় নিদ্রা যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে? মানুষ যদি এমনটি করতে চায়ও তথাপি কখনও তা সম্ভবপর হবে না বরং আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রাতের বেলায় ঘুমানো আর দিনের বেলায় কাজ করার অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

রাত্রীকে করেছি আবরণ আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।

(সূরা নাবা –১০,১১)

যখন ইচ্ছে মানুষ কাজকর্ম করবে আবার যখন ইচ্ছে শুয়ে যাবে এ স্বাধিনতা যদি মানুষকে দেওয়া হত তাহলে কেউ বলত– আমি দিনের বেলায় নিদ্রা যাব আর রাতের বেলায় কাজকর্ম করব। আবার কেউ বলত– আমি সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাব আর সকালে কাজকর্ম করব। কেউ বলত– আমি সকাল বেলায় ঘুমাব আর সন্ধ্যা বেলায় কাজকর্ম করব। এই

মতবিরোধের ফল এই দাঁড়াত যে, এক সময় কেউ ঘুমাতে যাচ্ছে আবার কেউ এ সময় খট খট করছে এবং নিজের পেশাগত কাজকর্ম করছে। এতে অপরের নিদ্রা নষ্ট হয়ে যেত। এভাবে দুনিয়ার নেযামই বরবাদ হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রাতের বেলায় ঘুমানো আর দিনের বেলায় কাজকর্ম করার আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছেন এবং এটা মানুষের সহজাত স্বভাব বানিয়ে দিয়েছেন।

রিযিকের দ্বার বন্ধ করো না

ঠিক এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। প্রত্যেকের মনেই আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তুমি এ কাজ করবে, তুমি এ কাজ করবে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে কোনও কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল এবং তোমাদের রুজি-রোজগারের জন্য কোন পথ খুলে দেওয়া হল, তখন স্মরণ রেখো! সে কর্মসংস্থান এমনিতেই হয়ে যায়নি বরং আল্লাহ তা'আলাই এর ব্যবস্থা করেছেন এবং বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেছেন। সুতরাং অকারণে জীবিকা নির্বাহের এ হালাল পথ ছেড়ে অন্য কোনও পথ অবলম্বন করার চিন্তা-ফিকির কর না। কে জানে, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এ পথেই কোনও মঙ্গল রেখে থাকবেন। তুমি এ কাজে লাগার কারণে না জানি কত মানুষের প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং নিজ ইচ্ছায় এই কর্ম সংস্থান ছেড়ে দিও না। তবে হাঁ, যদি কোনও কারণে ঐ চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিজে নিজে নষ্ট হয়ে যায় অথবা তাঁতে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেমন হাতের উপর হাত রেখে দোকানে বসে আছে, শত প্রচেষ্টার পরও একেবারেই আমদানী হচ্ছে না, তাহলে এমতাবস্থায় অবশ্যই এ পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনও দূরাবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের দ্বার নিজে নিজে বন্ধ করবে না।

এটা আল্লাহ তা'আলার দান

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব (রহ.) প্রায়ই এ শের বা পংক্তি আবৃত্তি করতেন – چیزے کہ بے طلب رسد آں دادہ خدا است

اورا تو رد مکن کہ فرستادہ خدا است۔

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন কোন জিনিস চাওয়া ছাড়াই হস্তগত হয়েছে তখন তাকে মিন জানিবিল্লাহ মনে করবে এবং তা ফিরিয়ে দিবে না। কেননা তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ্য থেকে প্রেরিত।

যা হোক! আল্লাহ তা'আলা যে উসীলায় তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিলেন তাতে লেগে থাকা চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এমনিতেই অবস্থা পাল্টে না যায়।

সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে

এ হাদীসের নিমিত্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার সাথে যেসব মো'আমেলা ও কাজকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে, সেগুলোকে আল্লাহ্ ওয়ালাগণ এরই উপর কিয়াস করেছেন। তাতে তাঁরা নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন না। অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে যেগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতির কাছে এর দৃষ্টান্ত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ এ হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে, বস্তুতঃ তা যদিও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু সূফী-সাধকগণ হাদীসখানার আলোকে এ মাসআলাও নির্ণয় করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনও বান্দার সাথে যে আচরণই করছেন, যেমন ইলমের ক্ষেত্রে, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোনও ব্যাপারে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার কোনও আচরণ করছেন, তাহলে (ঐ বান্দা) সে যেন নিজ হতে তা পরিবর্তনের চেষ্টা-তদবীর না করে বরং তার উপর দৃঢ় থাকে।

হযরত উসমান গণী (রাযি.) কেন খিলাফত ছাড়েন নি

হযরত উসমান গণী (রাযি.) -এর শাহাদাতের প্রসিদ্ধ ঘটনা হল, তার খেলাফতের শেষ যুগে তার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ঝড় বয়ে যায়। এর কারণও হযরত উসমান (রাযি.) নিজেই বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এক সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। তুমি নিজ ইচ্ছায় ঐ পোশাক খুলবে না। সুতরাং খিলাফতের এই জামা আল্লাহ তা'আলা আমাকে পরিধান করিয়েছেন, আমি নিজ ইচ্ছায় এ জামা খুলব না। সুতরাং তিনি খিলাফতের দায়িত্বও ছাড়েন নি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তরবারীও উঠান নি। তাদের মূল্যেৎপাটনের নির্দেশও দেন নাই। অথচ তিনি আমীরুল মুমিনীন ও খলীফা ছিলেন। তার কাছে সৈন্য-সামন্ত সবই ছিল। বিদ্রোহীদের দমন করা তাঁর সময়ের ব্যাপারও ছিল না। কিন্তু তিনি বললেন– বিদ্রোহী ও

হামলাকারীরাও যেহেতু মুসলমান তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তলনকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আমি হতে চাই না। সুতরাং তিনি খিলাফতের দায়িত্ব ছাড়েননি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়নও চালাননি বরং নিজেই গৃহবন্দী হয়ে গেলেন। এমনকি জান কুরবান করে দিলেন, শাহাদতের অমীয় সুধাপান করে ধন্য হলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) যে দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, এটা সে কথাই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের কাঁধে কোনও দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেন, তখন তোমরা তাতে ভালভাবে জমে থাক, নিজ হতে তা ছেড়ে দিও না, বর্জন কর না।

জনসেবার পদ আল্লাহর দান

যা হোক! আল্লাহ তা'আলা যখন দ্বীনের খেদমত করার কোনও রাস্তা তোমার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তা তোমার চাওয়া ছাড়াই মিলে গেল তখন অহেতুক কারণে তা পরিত্যাগ করবে না। কেননা তার মাঝে নূর ও বরকত নিহীত। অনুরূপভাবে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যত ধরনের অবস্থা, মো'আমেলা বা আচরণ হয়ে থাকে, ঐ সব হাল-অবস্থাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনে করে তাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিৎ। অনুরূপভাবে কখনও কখনও কারও সাথে আল্লাহ তা'আলার খাস মু'আমেলা ও বিশেষ আচরণ হয়ে থাকে, যেমন লোক জন নিজের সাহায্য সহযোগীতার জন্য এক ব্যক্তির দ্বারস্থ হয় অথবা দ্বীন-ধর্মের কর্মকাণ্ডের জন্য তার দ্বারস্থ হয় অথবা দুনিয়াবী কাজকর্মে তার পরামর্শের জন্য ছুটে আসে তবে বস্তুতঃ এটা এমন এক পদ যা আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাই মানুষের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, আপোষ কাজকর্মে তোমরা ঐ ব্যক্তির পরামর্শ নাও কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য সহযোগীতা নাও, ঝগড়া-বিবাদ হলে ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে মীমাংসা করাও। মানুষের অন্তরে এসব কথা এমনিতেই জাগেনি বরং আল্লাহ তা'আলাই মানুষের অন্তরে এসব কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।

সতুরাং তার এ পদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মিলেছে। এখন নিজের পক্ষ থেকে তা নষ্ট করবে না। কেননা তা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। আর এ জনসেবাকে আল্লাহ প্রদত্ত মনে করে মনোযোগ দিয়ে করতে থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ, কখনও কখনও বংশের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এমন পদমর্যাদা দান করেন যে, বংশের মধ্যে কোনও ঝগড়া-বিবাদ হলে বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে, লোকেরা তৎক্ষণাত তার কাছে চলে যায় এবং তার সাথে পরামর্শ করে। এতে সে কখনও কখনও ঘাবড়িয়ে যায় যে, দুনিয়ার সকল কাজকর্ম, ঝগড়া-ফ্যাসাদে লোকজন আমার দ্বারস্থ হয়। বস্তুত: এটা ঘাবড়ানোর মত কিছু নয়। কেননা লোকজন আপনার দ্বারস্থ হওয়ার ফলে বুঝা যায়, এটা মিন জানিবিল্লাহ লোকদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তার দ্বারস্থ হও। এ পদ মর্যাদা আল্লাহ তাআলারই দান।

بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو + زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو!

অতএব এ পদমর্যাদাকে উপেক্ষা কর না, নিস্প্রয়োজনীয় ভাব দেখিও না বরং সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করে নাও যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ খেদমতের দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ঘটনা

হযরত আইয়ূব (আ,)-এর প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি একবার গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় তার উপর স্বর্ণের প্রজাপতি বা এক প্রকার ছোট পাখী বর্ষণ হতে লাগল। সুতরাং তিনি গোসল বন্ধ করে দিলেন এবং স্বর্ণের পাখি জমা করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করলেন– হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে ধনী বানাই নাই? তোমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধন-সম্পদ দেই নাই? তবুও তুমি এ স্বর্ণের পাখি জমা করার জন্য দৌড়াচ্ছ কেন? উত্তরে হযরত আইয়ূব (আ.) বললেন– হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আপনি আমাকে এত ধন-দৌলত দান করেছেন যে আমি তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে সক্ষম নই, কিন্তু আমার চাওয়া ছাড়াই যে ধন-দৌলত আপনি আমাকে দান করেছেন তাতে কখনও অমোখাপেক্ষীতা প্রকাশও করতে পারি না যে, আপনি আমার উপর স্বর্ণখন্ড বর্ষণ করলেন আর আমি বলে দেই, আমার প্রয়োজন নেই। আপনি যখন দিচ্ছেন, তখন আমার কাজ হল, মোহতাজ ও মোখাপেক্ষী সেজে সে দিকে যাওয়া এবং তা কুড়িয়ে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে হযরত আইয়ূব (আ.) -এর দৃষ্টিতে আকাশ থেকে বর্ষিত ঐ স্বর্ণের পাখী উদ্দেশ্য ছিল না বরং তার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল এর মহান দাতা সত্ত্বার উপর, কার হাতে এ সম্পদ মিলছে! আর দানকারী সত্ত্বা যখন এত মহামহীম তখন মানুষের জন্য উচিৎ এগিয়ে এসে এবং মোখাপেক্ষী হয়ে তা গ্রহণ করা।

ঈদ-সালামী বেশি চাওয়ার ঘটনা

আমি এর দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি এই যে, আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) ঈদের সময় সকল সন্তানদেরকে ঈদ-সালামী দিতেন। আমরা সব ভাই মিলে প্রতি বছর ঈদের সময় তার কাছে গিয়ে ঈদ-সালামী চাইতাম। বলতাম, গত ঈদে আপনি বিশ টাকা দিয়ে ছিলেন, এ বছর জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে, কাজেই এ বছর পঁচিশ টাকা দিন। প্রতি বছর বাড়িয়ে চাইতাম, বিশ এর জায়গায় পচিশ টাকা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা, ত্রিশ টাকা থেকে পয়ঁত্রিশ টাকা চাইতাম। জবাবে হযরত আব্বাজান বলতেন– তোমরা চোর ডাকাত লোক, তোমরা প্রতি বছর বাড়িয়ে বাড়িয়ে চাও ?

লক্ষ্য করুন! সে সময় আমরা সব ভাই-ই প্রচুর রুজি-রোযগার করতাম, হাজার হাজার টাকা কামাই করতাম। কিন্তু যখন আব্বাজানের কাছে যেতাম তখন আগ্রহ ভরে তার কাছে চাইতাম। কেন এমন করতাম? প্রকৃত কথা হচ্ছে, ঐ টাকার দিকে নযর ছিল না বরং নযর ছিল ঐ হাতের উপর, ঐ মোবারক হাতে যা কিছু পাব এতে যে নূর ও বরকত হবে হাজার ও লাখের মাঝেও সে নূর ও বরকত হতে পারে না। দুনিয়ার সাধারণ সম্পর্কের কারণে যখন মানুষের এ অবস্থা হতে পারে তখন আল্লাহ তা'আলা যিনি আহকামুল হাকীমীন তার সাথে সম্পর্কের কি অবস্থা হতে পারে? অতএব যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইবে তখন মোহতাজ ও মোখাপেক্ষী হয়ে চাইবে। আঁর যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু আসে তখন তা মোহতাজ হয়ে গ্রহণ করবে; কোনরূপ অমোখাপেক্ষীতা দেখাবে না।

چوں طمع خواہد سلطان دیں + خاک برفرق قناعت بعد ازیں

তিনি যখন চান, তার সামনে লালসা প্রকাশ করি –এমতাবস্থায় অল্পেতুষ্টির মুখে ছাই। তখন মানুষ লালচে হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে চাইবে আর যা কিছু মিলবে তাই গ্রহণ করবে –এর মাঝেই তো প্রকৃত স্বাদ ও মজা বিদ্যমান। সুতরাং যে কাজে আল্লাহ তা'আলার নিযুক্ত করলেন বা যে পদে অধিষ্ঠিত করলেন, সবই তার অনুগ্রহের দান, তা নিজ হতে পরিত্যাগ কর না। তবে হাঁ, যদি অবস্থা এমন প্রতিকূল হয়ে যায়, যে কারণে ছেড়ে দিতে মানুষ বাধ্য হয় অথবা নিজের বড় কেউ বলে দেয়,

যেমন সে কাজ ছাড়ার ব্যাপারে বড় কারও সাথে পরামর্শ করল, আর তিনি বলে দিলেন, একাজ ছেড়ে দেওয়াই এখন তোমার জন্য মোনাসেব ও যথাযত হবে। তাহলে তখন সে কাজ ছাড়া যেতে পারে।

সার কথাঃ

যে নেয়ামত নিজের একান্ত প্রার্থনা ছাড়াই হস্তগত হয়ে যায় তা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত। এর না শুকরি, না কদরী ও অবমূল্যায়ন করো না। কখনও কখনও তা প্রত্যাখ্যান করা এবং অমোখাপেক্ষীতা দেখানোর পরিণাম বড় ভয়াবহ হয়ে যায়, (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) আল্লাহ তা'আলার গযব ও বিপদ এসে পড়ে। সুতরাং যে জিনিস চাওয়া ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসে যায় অথবা আল্লাহর তৈরী আসবাবের মাধ্যমে তথা এমন আসবাবের মাধ্যমে কোনও (হালাল) জিনিস মিলে যায় যার ধারণা জ্ঞানও ইতোপূর্বে ছিল না। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে তা কবুল করে নেওয়া চাই।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা যাকে যে খেদমতে নিযুক্ত করেছেন, দৃঢ়তার সাথে সে খেদমতে লেগে থাকা উচিৎ। এ খেদমত থেকে নিজের খেয়াল খুশি মত অবসর নেওয়ার চেষ্টা করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ খেদমতে লাগিয়েছেন এবং তোমার দ্বারা এ খেদমত নিচ্ছেন। এভাবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চাওয়া ছাড়াই কোনও পদমর্যাদা দান করেন, যেমন তোমাকে নেতা বানিয়ে দেন আর লোকেরা তোমাকে প্রসিডেন্ট মনে করে তাহলে বুঝে নাও, আল্লাহ্ তা'আলা এ খেদমত তোমার কাঁধে ন্যাস্ত করেছেন। এ খেদমতের হক তোমাকে আদায় করতে হবে। যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে এই খেয়াল কর যে, আমার নিজের যতটুক যোগ্যতা আছে তাতে আমি না নেতা হওয়ার যোগ্য, না সরদার হওয়ার যোগ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমাকে এ খেদমতে নিযুক্ত করেছেন, তাই তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে আছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং এ সব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

واخردعو انا ان الحمد لله رب العا لمين

সমাপ্ত

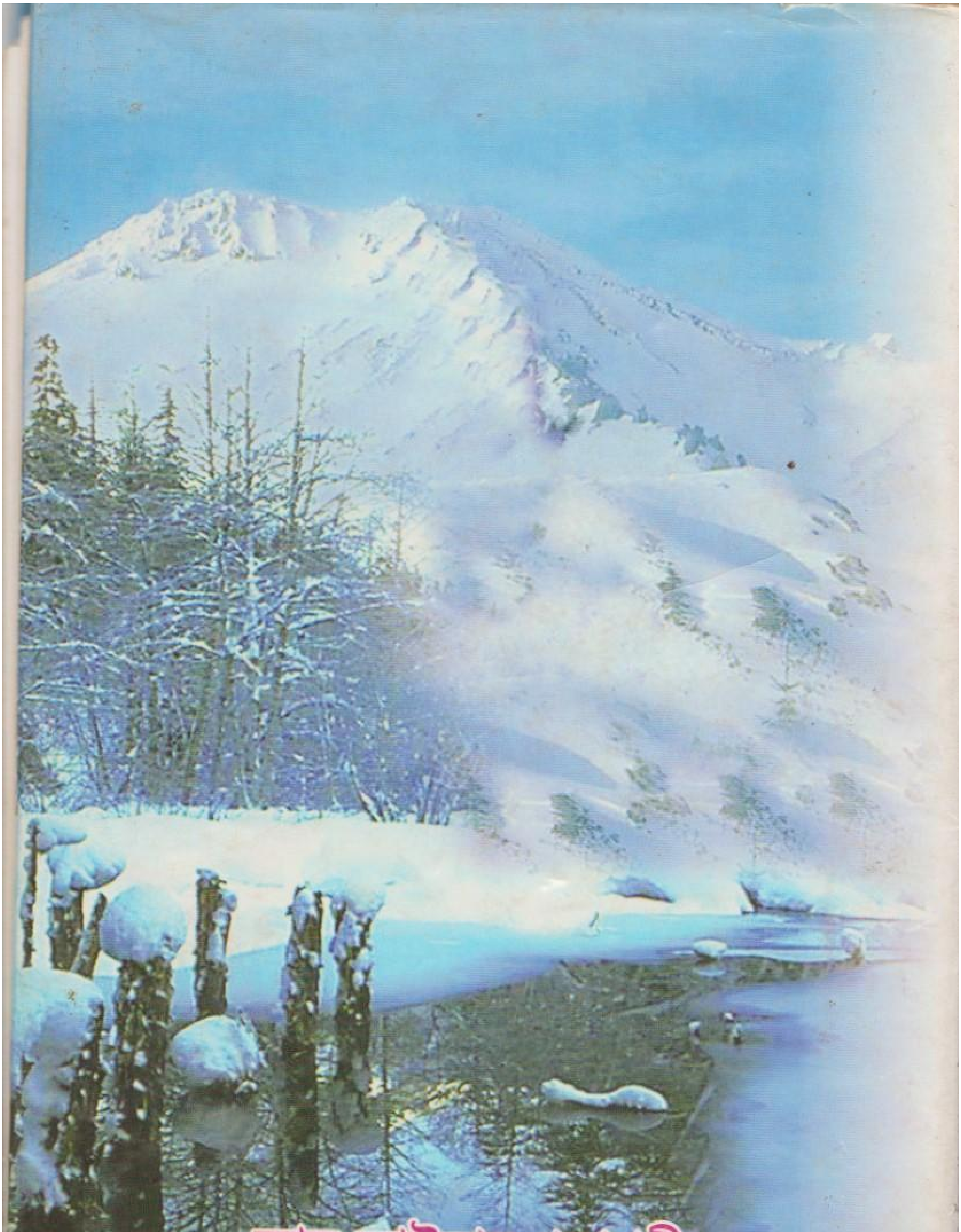
আল-কাউসার প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) ঢাকা